প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক :

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা—১

বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

আসেম আনসারী

মুদ্রাকর :

প্রভাংশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা—১

বাংলাদেশ

মূল্য ছয় টাকা

অনুবাদকের কথা

উর্দু সাহিত্যে সা'দত হাসান মান্টো একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি বিপ্লবী কন্টস্বর। স্পষ্টভাষী লেখক মান্টো সমাজের মিথ্যা আবরণ ও ভণিতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চান। তার গল্প ও প্রবন্ধে মানবতার অপমানকারীদের ভদ্রভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। মান্টো মানববাদী লেখক। তাঁর রচনায় সমাজের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত গোষ্ঠির জন্য সীমাহীন দরদ ফুটে উঠেছে। সাহিত্য ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। 'গল্পলেখক ও অশ্লীলতা' শীর্ষক প্রবন্ধে মান্টো বলেছেন, "বিশ্বের সব দুর্গতি ও দুর্ভোগের মূল কারণ ক্ষুধা। ক্ষুধা মানুষকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করে, অপরাধের দিকে ধাবিত করে। ক্ষুধা চরমপন্থী হওয়ার শিক্ষা দেয়। ক্ষুধা নারীকে সতীত্ব বিক্রি করতে বাধ্য করে। ক্ষুধার জ্বালা ভীষণ জ্বালা। এর আঘাত মারাত্মক। ক্ষুধা মানুষকে পাগল ক'রে তোলে কিন্তু পাগলামি ক্ষুধার সৃষ্টি করে না।"

সাহিত্য সম্পর্কে মান্টোর ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সাহিত্য সম্পর্কে মান্টো 'কষ্টিপাথর' শীর্ষক রচনায় বলেছেন, "সাহিত্য মনোরম অলঙ্কার স্বরূপ কিন্তু তা স্বর্ণ নয়। তেমনি মনোরম সাহিত্য পত্রিকাগুলি নির্ভেজাল সাহিত্য হতে পারেনা এবং সাহিত্যকে সোনার ন্যায় কষ্টি পাথরে ঘষে ঘষে মূল্য যাচাই করা বোকামী মাত্র। সাহিত্য হয় সাহিত্য নচেৎ মারাত্মক কু-সাহিত্য। অলঙ্কার দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু আবার অনেক সময় সোনার অলঙ্কারও দেখতে কুশ্রী লাগে। সাহিত্য ও অসাহিত্য, অলঙ্কার ও বিশ্রী অলঙ্কারের মাঝে কোন সীমারেখা নেই।"

"সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। কিন্তু সাহিত্য এমন ধরণের লাশ নয়, যাকে ডাক্তার তার সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে পোষ্ট মর্টেম করতে পারেন। সাহিত্য রোগ নয় বরং রোগের প্রতিষেধক। সাহিত্য ঔষধ নয় যার ফর্মুলা বা পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। সাহিত্য দেশ ও জাতির থার্মোমিটার। সাহিত্যই জাতির সবল স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার লক্ষণের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।"

বিগত একদশকের অধিককাল আমি মান্টোর রচনা অনুবাদ ক'রে আসছি এবং তার অধিকাংশ অনুবাদ বিভিন্ন সাময়িকী ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি মান্টোর ৮টি রচনা নিয়ে। 'মান্টোর সাহিত্যজীবন' নিবন্ধে আমি তার জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে আসার পর মান্টোর প্রথম রচিত গল্প "ঠাণ্ডা গোস্ত"। এই গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর অশ্লীলতার অভিযোগে দীর্ঘদিন মামলা চলে। অবশ্য মান্টো পরে বেকসুর খালাস পান। 'ঠাণ্ডা গোস্তের মামলা' শীর্ষক নিবন্ধে মান্টো সুন্দরভাবে মামলার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাঙালী পাঠকসমাজে মান্টো সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকসমাজ খুব বেশি পরিচিত নন। কেননা ইতিপূর্বে তাঁর কোনো প্রবন্ধ সংকলন বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। পাঠকমহলে এই পুস্তকটি সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

—জাফর আলম

সূচীপত্র

সা'দত হাসান মান্টোর সাহিত্য জীবন

এই উপ-মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও উর্দু সাহিত্যের অনন্য-সাধারণ প্রতিভা সা'দত হাসান মান্টো ১৯১২ সালের ১২ই মে অমৃতসর জেলার সোমরালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃব্য বংশগত দিক থেকে কাশ্মীরী ছিলেন কিন্তু পরে হিজরত করে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মান্টোর পিতা অমৃতসরে মুনসেফ ছিলেন। তাঁর দুই স্ত্রী। মান্টো দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে অমৃতসর থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং সেখানকার হিন্দু-মহাসভা কলেজে ভর্তি হন। তদানীন্তন বিশিষ্ট সমাজবাদী লেখক ও ইতিহাসবেত্তা 'বারী আলীগ'-এর সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর রচনার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত উদার। মান্টো বারী আলীগের পাণ্ডিত্যে ও বিপ্লবী চরিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ লেখনীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে মান্টো বই পড়া ও গল্প লেখার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এই সময় বিদেশী সাহিত্যের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং বিশ্বের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মননশীল সাহিত্য-পুস্তক মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন।

অনুবাদক হিসেবে মান্টোর সাহিত্যজীবনে প্রবেশ। সর্বপ্রথম তিনি ফ্রান্সের খ্যাতনামা লেখক ভিক্টোর হুগোর একটি উপন্যাস 'কয়েদীর ডাইরী' নামে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। এই উপন্যাসে মৃত্যুদণ্ডদানের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে। অতঃপর মান্টো ইংল্যণ্ডের খ্যাতনামা লেখক অস্কার ওয়াইল্ডের 'বেবারা' নাটক অনুবাদ করেন।

মান্টোর জীবনে চরম দুর্যোগ

বারী সাহেব অমৃতসর থেকে 'খল্‌ক' নামে একটি উর্দু সাপ্তাহিকী প্রকাশ করেছিলেন। এই উর্দু সাপ্তাহিকে মান্টোর প্রথম গল্প 'তামাসা'

প্রকাশিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ভিত্তিতে এই গল্প রচিত। এই গল্পের মাধ্যমে মান্টোর সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। এই সময় তিনি ফরাসী, ইংরেজী ও রুশ সাহিত্যের মোপাসা, সমারসেট মম এবং ম্যাকসিম গোর্কীর রচনা পড়ে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কলেজজীবনে মান্টো লাহোরের প্রসিদ্ধ সাময়িকী "হুমায়ুন" ও "আলমগীর"-এর ফরাসী ও রুশ সাহিত্য সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেন। একই সাথে তাঁর পড়াশুনাও চলছিল। কিন্তু মান্টো ছকে বরাবাঁধা পাঠ্য-পুস্তকে বিশেষ মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গতানুগতিক ক্লাসের বই পড়ায় তিনি কখনও মনোনিবেশ করতে পারেননি।

যৌবনে একবার মান্টো হাওয়া পরিবর্তনের জন্য কাশ্মীর বেড়াতে যান। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঘেরা কাশ্মীরের উপত্যকায় অবস্থানকালে মান্টো এক মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হন যা তাঁর ব্যক্তি ও সাহিত্য-জীবনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই ঘটনা মান্টো বিস্তারিতভাবে তাঁর "ভিগো ও একটি চিঠি" নামক নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন। মান্টোর জীবনের এই ঘটনা তাঁর সংবেদনশীল বিশেষ গল্পগুলি উপলব্ধি করতে অনেকাংশে সাহায্য করে। বুকে বিরাট বেদনার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে মান্টো অমৃতসর ফিরে এসে পড়াশুনায় মনোনিবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মান্টোর স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে পড়ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এক্সরে করার পর তাঁর যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ে। ফলে মান্টোর পড়াশুনায় এখানেই চিরদিনের জন্য ছেদ পড়ে যায়।

সাহিত্য-জীবনের উন্মেষ

পিতার মৃত্যুর পর আলীগড় থেকে বাড়ী ফিরে মান্টো চাকরির সন্ধানে লাহোর চলে যান এবং সেখানে করম চান্দ নামক জনৈক ব্যক্তির 'পারেস' নামক পত্রিকায় ৪০ টাকা বেতনে চাকরি নেন। কিছুদিন পর পত্রিকার মালিকের সাথে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় মান্টো চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে বোম্বে যাত্রা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বোম্বে ছিল ভারতের অন্যতম সর্বাধুনিক সুন্দর শহর। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্র ছিল বোম্বে। তাছাড়া বোম্বে ছিল ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র। এখানে চিত্রজগতে উর্দু লেখক ও কবিদের ছবির কাহিনী লিখে ভাগ্য উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। মান্টো বোম্বের "মোসাব্বির" সিনেমা সাময়িকীর ভারপ্রাপ্ত-সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে এখানেই মাণ্টোর সক্রিয় সাহিত্য-জীবনের সূচনা। দীর্ঘদিন বোম্বে অবস্থানকালে মাণ্টো গভীরভাবে সে-খানকার চিত্রজগতের জীবনধারা পর্যালোচনা করেন এবং তাঁর গল্পের জন্য বিষয়বস্তু ও চরিত্র সন্ধানে উদ্যোগী হন। 'গানজে ফারিশতায়' তাঁর প্রথম লেখনী ছায়াছবির বিশেষ চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে এবং অধিকাংশ গল্পে বোম্বে শহরের জীবনযাত্রার বিচিত্র রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। বোম্বে শহরের সাথে তাঁর নাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই বোম্বেকে তিনি দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে আখ্যায়িত করেন। ১৯৪৯ সালে বোম্বে শহরেই মান্টোর বিয়ে হয়। বোম্বে শহরেই তাঁর প্রথম সন্তান 'আরিফ' ভূমিষ্ঠ হয়।

১৯৪১ সালে মান্টো সিনেমা সাময়িকী মোসাব্বির-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্রে চাকরি নেন। দিল্লী বেতারের জন্য মান্টো শতাধিক উর্দু ফিচার ও নাটিকা রচনা করেন যা শ্রোতাদের কাছে দারুণ জন-প্রিয়তা লাভ করে। বেতারের মাধ্যমে মান্টোর সুখ্যাতি সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। রেডিওতে চাকরির সময় মান্টো যথারীতি উর্দু গল্প লিখতে থাকেন এবং দেশের বিশিষ্ট উর্দু পত্রিকায় তাঁর গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয়। দিল্লীতে হঠাৎ তাঁর শিশুপুত্র আরিফের মৃত্যুতে মাণ্টো দারুণ মর্মাহত হন। এই বেদনা আমৃত্যু তাঁকে বিদ্ধ করেছে।

চলচ্চিত্র কাহিনীকার মাণ্টো

প্রায় দেড় বছর দিল্লী অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে কাজ করার পর মাণ্টো পুন-রায় বোম্বে ফিরে আসেন এবং বোম্বে ফিলমিস্তান লি:-এ সংলাপ রচয়িতা ও কাহিনীকার নিযুক্ত হন। এই কোম্পানীর জন্য তিনি কয়েকটি ছবির কাহিনী রচনা করেন। "আটদিন" ছবিতে মান্টো স্বয়ং অভিনয় করেন। বিশিষ্ট চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক সোহরাব মোদী পাক-ভারতের বিখ্যাত উর্দু কবি মীর্জা গালিবের জীবনকাহিনী নিয়ে একটি ছবি নির্মাণ করেন। এই ছবির কাহিনীকার হলেন সা'দত হাসান মান্টো।

বোম্বে শহরে কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করার পর ১৯৪৮ সালে মাণ্টো লাহোর চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ই জানুয়ারী তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৩ বছর।

বেঁচে থাকতে মাণ্টো সমাজে যথাযথ মর্যাদা পাননি এটাই তাঁর দুঃখ। আশা ছিল তাঁর সাহিত্য ও শিল্পপ্রতিভার মর্যাদা তিনি পাবেন। এই আশা নিয়ে তিনি মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি লিখেছেন, "আমার বর্তমান জীবন নানা দুর্যোগ ও দুর্ভোগে পরিপূর্ণ। দিন-রাত কঠোর পরিশ্রমের পর আমার দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সামান্য উপার্জন করি। এই বেদনা আমার যক্ষ্মা রোগের ন্যায় সর্বদা বুকে টনটন করে। আজ যদি আমি চোখ বজি তাহলে আমার স্ত্রী ও তিন তিনটি শিশু-কন্যার দেখা-শুনার দায়িত্ব কে নেবে?"

উপরোক্ত কথাগুলি বর্তমান সমাজের সংকীর্ণতা ও দীনতার বিরুদ্ধে একজন সত্যিকারের সৃজনশীল শিল্পীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

মানবদরদী মাণ্টো

সা'দত হাসান মাণ্টো মূলত একজন বাস্তববাদী লেখক, মানবতার সেবক ও শিল্পী। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে বুঝতে হলে মাণ্টো মানুষের সম্পর্কে কি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন তা আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

উর্দু-সাহিত্যের বিশিষ্ট মহিলা সমালোচক মমতাজ শিরীন বলেছেন, "মানুষের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আদর্শ অত্যন্ত মহান। মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশসাধন তখনই সম্ভব যখন সে সমাজের বাধা-বিপত্তি ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।"

মাণ্টোর গল্পে আমরা এমন সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই যা বাহ্যত চরিত্রহীন ও মানবতাবোধ হারিয়ে বসেছে বলে অনুমিত হয়। কিন্তু এইসব চরিত্র এর পরও মানুষ হিসেবে পাঠকের মনে চির জাগরূক থাকে। মানুষ ও সমাজের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মাণ্টো লিখেছেন, "পৃথিবীতে যতগুলি

পাপ আছে, ক্ষুধা তাদের মা-স্বরূপ। ক্ষুধা মানুষকে পাপের পথে ধাবিত করে, ক্ষুধা সতীত্ব বিকিয়ে দিতে বাধ্য করে। ক্ষুধার জ্বালা বিষম জ্বালা। এর আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক। ক্ষুধা মানুষকে পাগল করে তোলে কিন্তু পাগলামো দ্বারা ক্ষুধা সৃষ্টি হয় না।"

মাণ্টো সমাজের নীচুর তলা থেকে গল্পের চরিত্র গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সমাজের এই নির্যাতিত ও নিপীড়িত পতিতাদের প্রতি মাণ্টোর সহানুভূতির অন্ত নেই। সমাজের ভুল বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবিচারের ফলে এই নিপীড়িত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে অথচ সমাজ এদের গ্রহণ করতে রাজী নয়। কিন্তু যখন মাণ্টো সমাজের এই অবহেলিত ও নির্যাতিত মানুষকে বুকে তুলে নেন এবং শিল্পীর শক্তিধর লেখনীর মাধ্যমে এদের চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন তখন আমরা সকলে সমস্বরে বলে উঠি, "মানবতা বেঁচে আছে, মানবতার মৃত্যু নেই।" এখানেই মান্টোর শিল্পীপ্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্য ও সাফল্য নিহিত।

জীবনের প্রতিচ্ছবি

মানুষ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনার পর মান্টো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষ কখনও পাপ নিয়ে জন্মায় না। ভাল মন্দ পরে বাইরে থেকে তার মনে ও কল্পনায় প্রবিষ্ট হয়। কেউ এই পাপকে সযত্নে প্রতিপালন করে থাকেন, অবশ্য সকলে তা করেন না। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, বাল্যকালে মানুষ নিষ্পাপ ও সৎ থাকে। পারিপার্শ্বিকতা পরে মানুষকে বিপথগামী হতে বাধ্য করে। মান্টো স্বচক্ষে যা দেখেছেন, বিনা দ্বিধায় সুস্পষ্ট ভাষায় তা পাঠকদের কাছে পেশ করেছেন। কারণ, মূলত তিনি বাস্তবধর্মী লেখক। তাই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবজীবনকে তিনি উপলব্ধি করেন অন্যকে তা উপলব্ধি করাতে চেষ্টা করেন। মান্টো কোন বিশেষ আদর্শকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাই অনেকে তার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বিশেষ মতাদর্শের নয় বলে মান্টোর শিল্পীপ্রতিভাকে অস্বীকার করা সাহিত্যের নৈতিকতার পরিপন্থী। মান্টো সাহিত্যকে রাজনৈতিক প্রচারণার উর্ধ্বে রেখে সামাজিক সমস্যা ও শ্রেণী বিভেদকে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন—এটাই একজন সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য। উর্দু সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক ডঃ আহসান

ফারুকী মান্টো সম্পর্কে বলেছেন, "প্রকৃতপক্ষে উর্দু সাহিত্যে গল্পের ধারা মান্টো থেকে শুরু। এই ব্যাপারে মতভেদ থাকতে পারে। প্রেমচাঁন্দ-এর পর সবচেয়ে শক্তিধর উর্দু গল্পলেখক হলেন মান্টো। প্রেমচাঁন্দ সাহিত্যকে সমাজের বহির্জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতর করেছেন আর মান্টোর গল্প উর্দু সাহিত্যকে আরও গভীরে নিয়ে গেছে।"

যখন মান্টো অন্ধকার গলির পতিতালয়ের সুগন্ধি, সুলতানা, খুসীয়া, বাবু গোপীনাথ প্রভৃতি চরিত্রকে প্রকাশ্য রাস্তায় নিয়ে আসেন তখন সমাজ এইসব চরিত্রহীনা ভ্রষ্টাদের বরদাস্ত করতে পারে না। ফলে, মান্টোর লেখাকে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকে তাকে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করেছেন; কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনার মাঝে একটি বলিষ্ঠ আওয়াজ সর্বদা ধ্বনিত হয়েছে: "মান্টো একজন খ্যাতনামা শক্তিধর উর্দু লেখক।" তাছাড়া মান্টোর গল্পের কথা অত্যন্ত সহজ ও সরল। মান্টো উর্দু সাহিত্যের সর্বাধিক নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত লেখক। অশ্লীলতার অভিযোগে এই স্পষ্টবাদী মানবদরদী লেখককে বহুবার আদালতের আসামীর কাঠগড়ায় হাজির হতে হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই মান্টো বেকসুর খালাস পেয়েছেন। শত নির্যাতন ও হুমকির মাঝেও মান্টো নিজ বিশ্বাস ও সংকল্পে অটল ছিলেন।

মূলত, মান্টো গল্পলেখক কিন্তু তিনি বহু প্রবন্ধ, নাটিকা ও ফিচার রচনা করেছেন; তন্মধ্যে "মান্টোকে মজামিন" এবং "জানাজে" উল্লেখযোগ্য। মান্টো একটিমাত্র উপন্যাস রচনা করেন; তা তাঁর নিজের মনঃপূত হয়নি। ক্ষুধা, অভাব, অনটনের তাড়নায় তিনি ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে যে সব উর্দু গল্প রচনা করেছেন তাঁকে তা উর্দু সাহিত্যে চির অমর করে রাখবে। নিজের লেখনীর খ্যাতি ও অমরতা সম্পর্কে মান্টো ছিলেন খুবই আস্থাবান। এ সম্পর্কে একটি ছোট্ট ঘটনা শুনুন:

রাওয়ালপিণ্ডি কলেজের জনৈক ছাত্রকে মান্টো অটোগ্রাফ দিয়ে তারিখের স্থানে ফাঁকা রেখে দেন। ছাত্রটি তারিখ না লেখার জন্য অনুযোগ করলে মান্টো উত্তর দেন, "আমার তারিখ মৃত্যুর পর লেখা হবে।"

মাণ্টোর প্রবন্ধ

গল্পলেখক ও অশ্লীলতা

যে-কোন নগণ্য বস্তু সমস্যার কারণ হতে পারে। মশারির অভ্যন্তরে একটি মশা অনুসন্ধান করে টিপে মারা আবার অন্যান্য মশার প্রবেশ রুদ্ধ করাও অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের প্রথম মানব যখন ক্ষুধা অনুভব করলেন তখন থেকে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ক্ষুধাই হচ্ছে সব সমস্যার মূল ভিত্তি। বিশ্বের প্রথম মানব যখন প্রথম মহিলার দেখা পেলেন তখন দ্বিতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই দুটি সমস্যা আপনারা জানেন দুটি ভিন্ন ধরনের ক্ষুধার ফলে সৃষ্ট। কিন্তু এদের মাঝে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই বর্তমানে যতগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও যুদ্ধ-সমস্যা রয়েছে সবকিছুর পেছনে উপরোক্ত দুটি ক্ষুধার সংযোগ পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান যুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পেছনে হাজার হাজার নিহত মানুষের লাশের স্তূপের মাঝে আমরা সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রবল ক্ষুধাই দেখতে পাই।

ক্ষুধা যে-কোন ধরনের হোক না কেন, অত্যন্ত মারাত্মক। স্বাধীনতাকামী মানুষকে যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয় তাহলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী।

একখণ্ড রুটির ভুখাকে যদি অনবরত অনাহারে রাখা হয় তাহলে অনন্যোপায় হয়ে সে অপরের মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে। পুরুষকে যদি নারী দর্শন থেকে বিরত রাখা হয় তখন সম্ভবত সে সমগোত্রের পুরুষ অথবা পশুর মাঝে নারীর প্রতিচ্ছবি দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করবে।

বিশ্বের সব দুর্গতি ও দুর্ভোগের মূল কারণ ক্ষুধা। ক্ষুধা মানুষকে ভিক্ষা করতে বাধ্য করে, অপরাধের দিকে ধাবিত করে। ক্ষুধা চরমপন্থী হওয়ার শিক্ষা দেয়। ক্ষুধা নারীকে সতীত্ব বিক্রী করতে বাধ্য করে। ক্ষুধার জ্বালা ভীষণ জ্বালা। এর আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক। ক্ষুধা মানুষকে পাগল করে তোলে, কিন্তু পাগলামো ক্ষুধার সৃষ্টি করে না।

পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের লেখক হন, তিনি প্রগতিবাদী বা গোঁড়া, বৃদ্ধ বা যুবক, তাঁর সম্মুখে বহু সমস্যা থাকে। বিষয়বস্তু নির্বাচন করে তিনি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লিখে থাকেন, কখনও কারও দাবির পক্ষে কখনও কারও বিরুদ্ধে।

আজকের সাহিত্যিকের সাথে নীতিগতভাবে পাঁচ শত বছর পূর্বের সাহিত্যিকের তেমন বিশেষ পার্থক্য নেই। প্রত্যেক জিনিসের উপর কালের গতিতে পুরাতনের উপর নয়া লেবেল লাগানো হয়। তা অবশ্য মানুষ লাগান না, যুগই তা সমাধা করে। আমাদের আজ তরুণ লেখক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আগামীতে আমাদেরকে পুরাতনের লেবেল এঁটে আলমারীতে বন্ধ করা হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের বেঁচে থাকা মূল্যহীন এবং আমরা অযথা শক্তি ক্ষয় করেছি। ঘড়ির কাঁটা যখন বারো থেকে দুই-এর দিকে এগিয়ে যায় তখন অন্যান্য অক্ষর বেকার হয়ে পড়ে না। সমগ্র চক্রাকার ঘুরে ঘড়ির কাঁটা আবার ঐ এক-এর স্থানে ফিরে আসে। এটাই ঘড়ির নিয়ম আর পৃথিবীর রীতিও তাই।

আজকের নতুন সমস্যা অতীতের পুরাতন সমস্যার মধ্যে মূলত বিশেষ তারতম্য নেই। আজকের দুষ্কর্মের বীজ হয়তো অতীতেই বপন করা হয়েছে। যৌন-সমস্যা যেমন আধুনিক লেখকের সম্মুখে রয়েছে তেমনি অতীতেও প্রাচীন লেখকদের কাছে একই সমস্যা বিদ্যমান ছিল। অতীতে লেখকরা প্রাচীন রীতিতে এই সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, আমরা একে নিজস্ব ঢং-এ লিপিবদ্ধ করছি।

আমি জানি না আমাকে কেন বার বার যৌন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। কারণ লোকেরা আমাকে প্রগতিবাদী লেখক নামে আখ্যায়িত করেছে, কারণ আমার কয়েকটি গল্প যৌন সমস্যা নিয়ে লিখিত। নতুবা কেন জানি না আজকের তরুণ লেখকদেরকে কিছুসংখ্যক লোক 'যৌন বিকার-গ্রস্থ'' বলে সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজ থেকে কলমের খোঁচায় বহিষ্কার করতে চান। কারণ যাই হোক না কেন, আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব ব্যাখ্যা করছি। রুটী আর পেট, নারী ও পুরুষের সম্পর্ক সনাতন ও চিরস্থায়ী। রুটী ও পেটের মধ্যে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং নারী-পুরুষের মধ্যেকার প্রয়োজনীয়তা কার বেশী তা বলা মুশকিল। কারণ আমার ক্ষুধার্ত পেট রুটী চায়। কিন্তু পেটের ন্যায় গমও আমার পেটের জন্য লালায়িত কি না

জানি না। তবে যখন ভাবি, জমিতে গম বেকার উৎপন্ন হয়নি বরং আমার উদর পূর্তির জন্য বিস্তৃত মাঠে এই সোনালী গমের চাষ করা হয়েছে, তখন বেশ আনন্দ পাই। হয়তো আমার উদর প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে আর গমের বীজ পরে।

যাহোক, একথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে বিশ্বের সাহিত্য শুধু মাত্র এই দু'টি বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। এমন কি, ঐশীবাণী সম্বলিত আসমানী কেতাবেও রুটী, উদর ও নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, যখন এই সমস্যা এতই প্রাচীন যে, আসমানী কেতাবেও আলোচনা রয়েছে, এমতাবস্থায় সাহিত্যে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হলে অশ্লীলতার ধোঁয়া তোলা হয় কেন। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে কেন বাঁকা নজরে দেখা হয়। এপ্রশ্নের উত্তর হল, মানুষ যদি একবার মিথ্যা না বলার, চুরি না করার অঙ্গীকার করলে সমগ্র বিশ্বে চুরি-ডাকাতি বন্ধ হয়ে যেত, তা হলে হাজার হাজার পয়গম্বরের পরিবর্তে একজন পয়গম্বর পাঠালেই যথেষ্ট হত। কিন্তু আপনারা জানেন বিশ্বের পাপ দুর্নীতি দূর করে মানুষকে সৎপথে পরিচালনার জন্য বহু মহাপুরুষ আল্লাহতালা পাঠিয়েছেন এজগতে। আমরা আইনবিশারদ বা অঙ্কবিশারদ নই। আইন প্রণয়ন ও হিসাব নিকাশ অন্যের কাজ। আমরা কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে লেখনীর মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু আমরা বিচারক নই। আমরা ইমারতের নক্সা তৈরী করি কিন্তু নিজে ইঞ্জিনিয়ার নই, আমরা রোগের প্রেসক্রিপশন করি কিন্তু নিজেরা দাওয়াখানার হাকিম নই।

আমরা যৌন ব্যাপারে লিখিনা বরং যারা এ কথা বলেন, তাঁরা ভুল বলছেন।

আমরা বিশেষ পুরুষ বা মহিলার জীবনযাত্রা ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখলে কারও আঁতে ঘা লাগার কথা নয়। কারণ আমার গল্পের নায়ক যদি শাদা কাপড় পছন্দ করেন এবং সেটাই তাঁর পরিচ্ছন্ন থাকার প্রতীক, তা হলে একে অন্য মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক বলে মেনে নেয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ঘৃণার কেন সূত্রপাত হয় এবং কি পরিস্থিতিতে তার জবাব আমার গল্পে অবশ্যই পাবেন।

যারা আমার গল্পে যৌন-আনন্দ পেতে চান, তাঁরা হতাশ হবেন। আমি ওষুধ বিক্রেতা, হাতুড়ে ডাক্তার নই বরং কেউ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে নিজের বিবেকবুদ্ধি মোতাবেক আপনাদের বুঝাতে চেষ্টা করি তার পতনের কারণ কি?

আমি আশাবাদী। আমি অন্ধকার পৃথিবীতে আলোর কিরণ দেখতে পাই। আমি কাউকে ঘৃণার নজরে দেখিনা। পতিতালয়ের কুঠরী থেকে পতিতা কোন পথচারীর উপর পানের পিক ফেললে আমি অন্যান্যদের সাথে এই দৃশ্য দেখে বেচারী পথচারীকে উপহাস করিনা বা পতিতাকে গালি দিইনা, বরং এই ঘটনা দেখে আমি থমকে দাঁড়াই আর আমার দৃষ্টি সেই ঘৃণ্য পেশায় নিয়োজিত মহিলার পোশাক ভেদ করে তার পাপিষ্ঠা দেহের অভ্যন্তরে অন্তরে গিয়ে উপনীত হয়। তাকে যাচাই করতে গিয়ে কল্পনা রাজ্যে কিছুক্ষণের জন্য আমি নিজেও একজন পতিতায় রূপান্তরিত হই। কারণ হৃদয় দিয়ে তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করাই আমার লক্ষ্য।

কোন অভিজাত বাড়ীর সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী কোন ভবঘুরে স্বাস্থ্য-হীন ক্ষীণকায় তরুণের সাথে পালিয়ে গেলে আমি ছেলেটিকে 'বদমাইস' বলে গালি দিইনা বা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানোর জন্য রায় দিই না। বরং আমি কি কারণে ছেলেটি বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সেই ছোট্ট গেরো খুলবার চেষ্টা করি।

মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একজন পুরুষ যে ভুল করে অন্যজনও তা করতে পারে। একজন মহিলা যদি দেহের বেসাতী চালাতে পারে, তাহলে দুনিয়ার তাবৎ মহিলা সকলেই তা করতে পারে। কিন্তু এই ভুলের জন্য মানুষ দায়ী নয়। পরিবেশ মানুষকে অন্যায়ের পথে টেনে নেয় আর সারাজীবন ভুলের ফসল কাটতে থাকে।

যৌন সমস্যা কেন আধুনিক লেখকদের অধিক দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে, তার উত্তর পেতে হলে বেশীদূর এগুতে হবে না। বর্তমান যুগটাই কেমন জানি জেদের যুগ। নারী কাছেও থাকে আর অনেক দূরেও। কখনও তাকে তেরহাত কাপড়েও উলঙ্গ মনে হয়, কখনও গামছা পরণে পর্দানশীন। কখনও নারী পুরুষের বেশে আর পুরুষ নারীর বেশে দেখা যায়।

বিশ্বে এখন ব্যাপক পরিবর্তন চলছে আর যুগটাই পাল্টে যাচ্ছে। ভারত উপমহাদেশে প্রাচ্য সভ্যতার জামা কখনও পরিধান করা হয় আবার তরুণরা তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আচার-অনুষ্ঠানের ঢেউও এখানে এসে লেগেছে আর চারিদিকে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। চারিদিকে একটা অস্থিরতা

বিরাজমান। নতুন খাট তৈরী হলে পুরানো খাট ফার্নিচার গুদামে পড়ে থাকছে। সমস্যার অন্ত নেই। খাট থেকে ছার পোকা বা বিচ্ছু বের হচ্ছে। কেউ বলে মেরে ফেল কেউ বলছে ছেড়ে দাও। এই অস্থিরতার মাঝে আমরা নবীন লেখকরা হাতে কলম নিয়ে কখনও এই কখনও সেই সমস্যার সাথে ধাক্কা খেয়ে মাথা কুড়ে মরছি।

আমাদের লেখনীতে যদি নারী-পুরুষের সম্পকের বিষয় প্রাধান্য পায় তা অস্বাভাবিক নয়। রাজনৈতিক ভিত্তিতে যদি একটি দেশ দ্বিখণ্ডিত করা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে যদি একটি অন্য থেকে পৃথক করা যায়, একই আইনে যদি জমির মালিকানা হাতছাড়া হতে পারে কিন্তু কোন রাজনীতি, বিশ্বাস বা আইনের দ্বারা নারী-পুরুষকে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

নারী-পুরুষের মাঝে যে বাধার বিন্ধ্যাচল আর প্রাচীর গড়ে উঠেছে, সব ,যুগেই তা অতিক্রমের চেষ্টা হয়েছে,ভবিষ্যতেও চলবে। যুগ যুগ ধরে নারী পুরুষের মাঝে গড়ে ওঠা দূরত্বের প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা চলে আসছে। যাঁরা এই সম্পর্ককে অশ্লীল মনে করেন, তাঁদের এই সংকীর্ণতার জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত। যাঁরা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে চরিত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করেন, তাঁদের জানা উচিত, চরিত্র সমাজের দেহে মরিচার ন্যায় জমাট বেঁধে আছে।

যাঁরা ভাবেন আধুনিক লেখকরা সাহিত্যে যৌনসমস্যার সৃষ্টি করছে, তাঁরা ভুল করেছেন, কেননা আসলে যৌনসমস্যাই আধুনিক সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। এই আধুনিক সাহিত্যে যখন আপনারা নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পান, তখন আঁতকে ওঠেন। সত্যকে যতই চিনি মিশায়ে খান না কেন, এর তিক্ততা দূর হবে না।

আমার লেখনী আপনাদের তেতো মনে হয় কিন্তু এ পর্যন্ত যে সব মিষ্টি ঘটনা মধুর করে রচিত হয়েছে তা কি মানবতার কোন উপকারে এসেছে? নিমের পাতা তেতো সত্য কিন্তু তা রক্ত পরিষ্কার করে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার কৈফিয়ত

১৯৪২ সালের লাহোরের "আদবে-লতিফ" উর্দু মাসিকের বার্ষিক সংখ্যায় আমার "কালো সেলোয়ার" নামক একটি গল্প প্রকাশিত হয়, অনেকে একে অশ্লীল বলে মনে করে থাকে। আমি তাদের ভ্রান্তধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখছি।

গল্প লেখা আমার পেশা। গল্প লেখার স্টাইল আমি সম্যক অবগত আছি এবং ইতিপূর্বে এই বিষয়বস্তু নিয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছি। এদের একটি গল্পও অশ্লীল নয়। আগামীতেও গল্প লিখব, তা অশ্লীল হতে পারে না।

গল্প বলার প্রথা বাবা আদমের আমল থেকে প্রচলিত। আমার মতে, এই গল্প বলা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এর পট পরিবর্তন হতে থাকবে। মানুষের নিজের আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করার ও অন্যাকে জানানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

পতিতাদের সম্পর্কে আমি অনেক কিছু লিখেছি, আগামীতেও অনেক লেখা হবে। আমাদের সামনে যা কিছু বিদ্যমান সবকিছুকে নিয়ে গল্প লেখা যায়। পতিতা আমাদের সামনে হাজার বছর ধরে বিদ্যমান আছে এবং পতিতাদের কথা আসমানী কেতাবে পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু আজকাল পতিতাদের কথা শুধুমাত্র পবিত্র কেতাব বা পয়গম্বরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং সংবাদপত্র, সাময়িকী ও পুস্তকে পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে; তাই এসব পত্র-পত্রিকা বা পুস্তক পাঠের জন্য আগরবাতি জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না; বরং তাদের কাহিনী পড়ার পর এই পত্র-পত্রিকা বা পুস্তিকা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলতে পারেন।

আমি একজন রক্ত-মাংসের গড়া মানুষ। আমি উপরোল্লিখিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর একজন লেখক। পত্র-পত্রিকায় লেখার উদ্দেশ্য

সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রয়েছে। আমি যা দেখি এবং যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি তা হুবহু অন্যদের কাছে উপস্থাপিত করি। যদি দুনিয়ার সকল লেখক পাগল হন তাহলে আমি তাঁদেরই একজন। "কালো সেলোয়ার" গল্পের পটভূমি একটি পতিতার কুটির। এই কুটিরে বিবাহিতা তরুণীদের বাড়ীর ন্যায় বৈচিত্র্য নেই। দিল্লীতে পতিতাদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় বহু কুটির নির্মিত হয়েছে। আমার সুলতানা এমনি এক কুটিরে বাস করে। নর্তকীদের বাড়ীর ন্যায় রাতে জোনাকিদের মেলা বসে না বরং সুলতানার কুটিরে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। যেহেতু এই বিজলী বা বাড়ী বিনামূল্যে সুলভ নয় এবং ভাড়া দিতে হয় তাই সুলতানাকে কায়িক পরিশ্রম করতে হত।

যদি সে বিবাহিতা হত তাহলে তার বাড়ী ভাড়ার প্রয়োজন হত না বরং সব কিছু বিনামূল্যে পেত। কিন্তু সুলতানার বিয়ে হয়নি বরং সে একজন মহিলা। যখন তাকে বিজলীর ভাড়া, ঘর ভাড়া আদায় করতে হয় এবং খোদা বখসের ন্যায় পীরভক্ত ভবঘুরে তার উপর ভর করেছে; এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা আর কোন মতেই সংসারী থাকতে পারে না, যারা আমাদের বাড়ী আলোকিত করে আছেন।

আমার সুলতানা পতিতালয়ের একজন মহিলা, তার পেশা পতিতাবৃত্তি। পতিতালয়ের মেয়েদের সকলেই চেনে। কেননা, প্রত্যেকটি শহরে পতিতালয় রয়েছে। প্রত্যেক শহরে ময়লা আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নালা নর্দমা রয়েছে। আমরা শ্বেতপাথরের নির্মিত বাথরুম, সাবান, লেভেণ্ডার প্রভৃতির কথা আলোচনা করি; কিন্তু নালা, নর্দমার কথা কেউ আলোচনাই করি না।

অথচ এইসব নালা আমাদের দেহের ময়লা হজম করে। আমরা যদি মন্দির ও মসজিদ নিয়ে তর্ক করতে পারি তাহলে সে সব পানশালার কথা কেন উল্লেখ করতে পারি না যেখান থেকে ফিরে অনেকে মসজিদ ও মন্দির-গামী হয়ে পড়ে। আমরা যদি আফিম, ভাঙ্গ, চরস এবং মদ্যশালার কথা আলোচনা করি তাহলে ঐসব পতিতার কুটিরের কথা কেন উল্লেখ করতে পারি না যেখানে সবরকম নেশার ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

নেশাগ্রস্তদের আমরা ঘৃণা করি, তাদের দেখলে নাকে রুমাল দি। কিন্তু নেশাখোরদের অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের দেহ থেকে যে ময়লা ও দূষিত পদার্থ দৈনিক নির্গত হয় তা অস্বীকার করার জো

নেই। পেটের অসুখ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও ব্যথা-বেদনার জন্য প্রতিষেধক ওষুধ রয়েছে; কারণ দেহের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করা অপরিহার্য। দেহের ময়লা নিষ্কাশনের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির বিষয় বিবেচনা করা হয়, কারণ দেহে দৈনিক ময়লা পুঞ্জীভূত হয়। আমাদের দেহে যদি ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং পেসাব পায়খানা ইত্যাদির রীতি বদলে যায় তাহলে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরাময় ও ব্যথা-বেদনার প্রশ্নই ওঠে না। অথবা ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যদি কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তাহলে নেশা খোরদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নেশাখোরদের বিষয় আলোচিত হলে ময়লা আবর্জনার প্রসঙ্গ আসবেই। আর যদি আমরা পতিতাদের বিষয় আলোচনা করি তাহলে তার পেশার প্রশ্ন আসতে বাধ্য।

পতিতাদের কুটিরে কেউ নামাজ বা দরুদ পড়তে যায় না বরং পতিতা-লয়ের গমনের উদ্দেশ্য সর্বজনবিদিত। কারণ আমরা সেখানে যেতে পারি এবং সেখানে গিয়ে আমরা কাম্য যৌন চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অনায়াসে দেহ ক্রয় করতে পারি। সেখানে গমনে কোন বিধি-নিষেধ নেই। প্রত্যেক মেয়ে স্ব-ইচ্ছায় পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে পারে এবং একটি লাইসেন্স নিয়ে যথেচ্ছ দেহের বেসাতি চালাতে পারে। তদুপরি আইনের চোখে যখন এই পেশা বৈধ—তাহলে এই ব্যাপারে আলোচনা করা যাবে না কেন?

যদি একজন পতিতার জীবন-কথা আলোচনা অশ্লীল হয়ে থাকে তাহলে তার অস্তিত্বও অশ্লীল, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের সম্পর্কে আলোচনা যদি নিষিদ্ধ হয় তবে পতিতাদের দেহ বিক্রিও নিষিদ্ধ। পতিতাদের নিশ্চিহ্ন করুন, তাহলে তাদের সম্পর্কে আলোচনা স্বভাবতই লোপ পাবে। আমরা আইনজীবী, জেলে, ধোপা, বেদে, তরকারি বিক্রেতার বিষয় আলোচনা করি। চোর, প্রতারক, দস্যুর কাহিনী বর্ণনা করি। জীন পরীদের কাহিনী বাড়িতে বসে মনোযোগ দিয়ে শুনি। আমরা এ কথাও বলি যে, দুনিয়াটা একটি ষাঁড়ের শিং-এর উপর অবস্থিত। আমির হামযা ও তোতা ময়নার কাহিনীর পুঁথি আমাদেরই রচিত। ওমর উম্মিয়ার জাম্বিল ও টুপির রসাল কাহিনী আমাদের আকর্ষণ করে। যাদুকরের মন্ত্র ও বহু ভাষায় পার-দর্শী তোতা-ময়নার কাহিনী লোকের কাছে বর্ণনা করে আনন্দ পাই। দাড়ি, পাজামা ও মাথার চুল নিয়ে আমাদের তর্কের অন্ত নেই। পোলাও, কোর্মা ইত্যাদি তৈরীর নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করি। আমরা সবুজ

কাপড়ে কি ধরনের বোতাম মানাবে তা ভাবতে পারি ; কিন্তু আমরা পতিতাদেব পেশা ও তাদের হাল হকিকত নিয়ে কোন চিন্তা করি না। কেন আমরা ঐসব লোক সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিনা যারা পতিতালয়ে যায়। আমরা একজন যুবক ও একজন যুবতীর মধ্যে প্রণয়ের সৃষ্টি করতে পারি ; তাদের প্রথম সাক্ষাৎকার দাতাগঞ্জ বখসের মাজারে ব্যবস্থা করতে পারি। একজন দালাল বুড়ী এই দুই প্রেম-পাগল প্রেমিক-প্রেমিকার নিয়মিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে পারে। অবশেষে ভালবাসায় ব্যর্থ হয়ে দু'জনকেই বিষে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। দুইজনের জানাজা দু' মহল্লা থেকে বের হয় ; আবার অলৌকিকভাবে তাদের কবর একত্রীভূত করতে পারি। প্রয়োজনবোধে ফেরেস্তারা তাদের কবরে পুষ্পবৃষ্টি করতে পারে। অথচ আমরা পতিতাদের জীবনকাহিনী বর্ণনার বেলায় কেন এত কার্পণ্য করি, বলা মুস্কিল। তারা ফেরেস্তার হাতে পুষ্পবৃষ্টি কামনা করে না। মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীরা পতিতাদের জানাজায় সহযোগিতা করে না, বা কেউ দু'টি গোর একত্রী-করণের ইচ্ছা প্রকাশ করে না। পতিতারা স্বয়ং একটি লাশ, যাদের সমাজ কাঁধে নিয়ে বেড়াচেছ। যেহেতু এই লাশ দাফন করা হয় না তাই তাদের নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। পতিতা নামক এই লাশ বিকৃত, গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত, বীভৎস সত্য ; কিন্তু তার মুখ দেখতে আপত্তি কি ? পতিতারা কি আমাদের কেউ নয় ; ওরা কি আমাদের আত্মীয় নয় ! আমি তাই মাঝে মাঝে কফিন সরিয়ে এই লাশের মুখ দেখি এবং অন্যদেরও দেখাতে থাকি। "কালো সেলোয়ার" গল্পে আমি এমনি লাশের মুখচছবি প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি।

সমঝদার পাঠক মাত্রই আমার গল্পের মূল লক্ষ্য অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন। সুলতানার জীবনের বাস্তব চিত্র আমি আকার ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। দিল্লী পৌরসভা পতিতাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় কোয়ার্টার তৈরী করে দিয়েছেন ; কিন্তু কখনও ভেবেও দেখেননি যে মালগুদামের সাথে পতিতাদের জীবনের সামঞ্জস্য রয়েছে। অবশ্য দূরদর্শী যে-কোন লোক পতিতালয় ও মালগুদামকে পাশাপাশি দেখে "কালো সেলোয়ার" এর ন্যায় বহু গল্প লিখতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আমি 'হাতাক" গল্পের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

"সে দারোগার কাছ থেকে দৈহিক পরিশ্রমের পরিবর্তে যা আদায় করেছে তা তার উদ্যত বুকের উপর কাঁচুলির ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাঝে

মাঝে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে রূপোর এই টাকাগুলি টুং টাং করে এবং টাকার এই শব্দগুলি তার অন্তরের অব্যক্ত স্পন্দনের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। মনে হয়, এই রূপোর মুদ্রাগুলি উত্তাপে গলে তার হৃদপিণ্ডে রক্তের ফোঁটা ফোঁটা পতিত হচ্ছে।"

নীচে সুলতানার বোন সুগন্ধির ছবি তুলে ধরছি। সুগন্ধির কাছে খোদা বখস ছাড়া এক কুকুর ছিল। খোদা বখস তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি; কিন্তু এই কুকুর তার কাজ দিয়েছে।

আমি গল্পের শেষাংশ উদ্ধৃত করছি:

"কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে সুগন্ধির কাছে ফিরে আসে এবং তার পায়ের কাছে বসে কান নাড়তে থাকে। চারিদিক নিস্তব্ধ নীরব। এই ধরনের নীরবতা সে কখনও দেখেনি। সব কিছুতেই শূন্যতা বিরাজ করছিল, যেন যাত্রীবাহী ট্রেন সব স্টেশনে যাত্রী নামিয়ে দেবার পর তখন সে একা দাঁড়িয়ে-ছিল। সুগন্ধিকে তেমনি নিঃসঙ্গতাবোধ বেদনাতুর করে তুলেছিল। সে এই শূন্যতাকে পূরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে; কিন্তু কোন ফল হয়নি। কল্পনারাজ্যে অনেককিছু চিন্তাভাবনা ভিড় জমানোর চেষ্টা করে কিন্তু তা নিমেষে বিলীন হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ সে বেতের চেয়ারে বসে থাকে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর মনকে প্রবোধ দেয়ার কোন উপায় না দেখে সুগন্ধি কুকুরটিকে কোলে তুলে নেয়। তার সেগুন কাঠের বিস্তৃত পালঙ্কে কুকুরটিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে।"

কেউ কি কখনও এই দৃশ্য দেখে আনন্দ উপভোগের জন্য পতিতার কুটিরে যাবেন।

আমার সুলতানা ও সুগন্ধি একা দেখার মতো চিত্র নয় যাদের বিজ্ঞাপন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়। তারা কোন মজার অতীত দিনের স্মৃতি বিবৃত করে না বা দেহতত্ত্ব প্রকাশ করে না যার ফলে যৌন-চেতনার উন্মেষ হবে ?

আমার আলোচ্য গল্প "কালো সেলোয়ার" মনোযোগের সাথে পড়লে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপনার সামনে প্রতিভাত হবে:

(১) সুলতানা একজন মামুলী পতিতা; প্রথমে আম্বালায় ছিল, পরে খোদা বখসের অনুরোধে দিল্লী চলে আসে; কিন্তু এখানে তার ব্যবসায় তেমন জমেনি।

(২) খোদা বখস একজন আল্লার উপর নির্ভরশীল ও ফকিরের কেরামতীতে বিশ্বাসী লোক ছিলেন।

(৩) সুলতানার দেহের বেসাতি ভাল চলেনি, তাই সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। খোদা বখস ফকিরের আস্তানায় ঘুরে ঘুরে সময় কাটাচ্ছিল ; ফলে তার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পায়।

(৪) মহর্‌রম সমাগত। সুলতানার বান্ধবীরা কাপড়-চোপড় তৈরী করে নিয়েছে ; কিন্তু সে তৈরী করতে পারেনি। কারণ তার পয়সা ছিল না।

(৫) ইত্যবসরে শংকর এসে হাজির হয়। সেও একজন ভবঘুরে, বুদ্ধিমান তর্কবাগীশ লোক ; তবে কপর্দকহীন। সে সুলতানার কাছে এসে বিনামূল্যে তার দেহভোগের প্রস্তাব দেয় ; কিন্তু সুলতানা রাজি হয়নি।

(৬) পরে সুলতানাই শংকরকে ডেকে আনে এবং তাকে জীবনে এক দুর্ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করে। তার সাথে সম্ভোগ করে সে তৃপ্তি পায়। কিন্তু সুলতানা তার কালো সেলোয়ারের অভাবের কথা ভোলেনি। সে শংকরকে বলে, "মহ্‌ররম সমাগত। আমার কাছে কালো সেলোয়ার তৈরী করার মত পয়সা নেই। বাড়ীর কাহিনী তো শুনেছ। কামিজ ও ওড়না আমার কাছে আছে, আজ দুটোই রং করতে দিয়েছি।"

(৭) শংকর মহর্‌রমের পয়লা তারিখ সুলতানার জন্য একটি কালো সেলোয়ার নিয়ে আসে। খোদা বখসের খোদা-ভক্তি ও ফকির-ভক্তি কোন কাজে লাগেনি। কিন্তু শংকরের বুদ্ধিমত্তা কাজে আসে।

এই গল্প পড়ে হৃদয়ে ও চিন্তারাজ্যে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ? গল্পের পটভূমি অথবা বর্ণনার স্টাইল কি মানুষকে পতিতাদের প্রতি আকৃষ্ট করে ? এর উত্তরে আমি বলবো, কখনও নয়। কারণ এই উদ্দেশ্যে আমি গল্প লিখিনি। আমার মতে, যদি এই গল্প পাঠে কারও মাঝে উপরোক্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় তাহলে তা কখনও অশ্লীল হতে পারে না।

"কালো সেলোয়ারের" ন্যায় গল্প শখ করে রচিত হয়নি যা পড়ার পরে যৌন-চেতনার সঞ্চার হবে। আমি কোন লজ্জাজনক কাজ করিনি বরং এই ধরনের গল্পের লেখক হিসেবে আমি গর্ববোধ করি।

আমি আনন্দিত যে আমি কোন 'মসনবী'র লেখক নই। নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক প্রসঙ্গে উর্দু কবিতায়, বিশেষত মীর দরদ ও মোমেনের কবিতায়,

নারী-পুরুষের মিলন সম্পর্কে যে অশ্লীল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে আমার গল্পে তার রেশমাত্র নেই। নারী-পুরুষের, প্রণয়-মিলনকে আকর্ষণীয় করে কবিতায় প্রকাশ আপত্তিজনক বলে মনে করি। কেননা, এই জাতীয় বন্য যৌন-চেতনা ও চিত্র দেখে সকলের মনে ঘৃণার উদ্রেক হবে। আমার "কালো সেলোয়ার" গল্পে নারী-পুরুষের যৌন-মিলনকে আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করিনি। আমার সুলতানা শ্বেতাঙ্গ খদ্দেরদের নিজ ভাষায় গালি-গালাজ করত এবং তাদের 'উল্লুক' মনে করত; এমতাবস্থায় এর মাঝে কোন প্রকার আনন্দ বা অনুভূতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে একজন দোকানদার, সত্যিকারের ব্যবসায়ী।

কেউ যদি কোন মদের দোকানে মদের বোতল আনতে যায় তার অর্থ এই নয় যে সে ওমর খৈয়াম বনে গেছে অথবা হাফিজের দেওয়ানগুলি তার মুখস্থ হয়ে গেছে। মদ ব্যবসায়ী শরাব বিক্রি করে; ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদী বা হাফিজ-শিরাজীর গজল বিক্রি করে না।

আমার সুলতানার পরিচয় সে একজন দেহপসারিণী, তারপর নারী। কারণ মানুষের জীবনে পেটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শংকর তাকে প্রশ্ন করে, "তুমি নিশ্চয় কিছু না কিছু কাজ কর?" সুলতানা বিনা দ্বিধায় উত্তর দেয়, "দেহ বিক্রি করি।" সে অবশ্য বলে না যে গম বিক্রি করি বা সোনা-রূপার ব্যবসা করি। সে তার পেশা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে। কোন টাইপিস্ট মহিলাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, সে-ও এমনিভাবে উত্তর দেবে, "টাইপ করাই আমার কাজ।" অতএব আমার গল্পের নায়িকা সুলতানা ও একজন টাইপিস্ট মহিলার মধ্যে বিশেষ তারতম্য নেই।

কষ্টিপাথর

এটা নতুন যুগ। জুতা নতুন, যাতনা নতুন, আইন নতুন, নতুন অপরাধ, নতুন ঘড়ি, নতুন প্রভু, নতুন চাকর, নফর ইত্যাদি মজার ব্যাপার, এই সব ভৃত্যদের গায়ের চামড়াও নতুন। এদিক সেদিকের ঘা খেয়ে এরা বেয়াড়া হয়ে পড়েছে। এখন এদের শায়েস্তা করার জন্য নতুন চাবুক ও ছড়ি তৈরী করা হচ্ছে।

সাহিত্যও নতুন এবং এর অনেক নামকরণ করা হয়েছে। কেউ সাহিত্যকে প্রগতিবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, কেউ অশ্লীল, কেউবা মজদুরপন্থী, অথবা কিছু রচনাকে পতনোন্মুখী সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা হচ্চে। এই সব নতুন সাহিত্যকে পরখ করার জন্য নতুন নতুন কষ্টিপাথরও রয়েছে। এই সব কষ্টিপাথর হল, মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক ও বার্ষিক সাময়িকী এবং পত্র-পত্রিকাসমূহ। এই সব পত্র-পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদকও নতুন। এরা কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ কংগ্রেস, কেউ মুসলিম লীগ বা কেউ কমিউনিস্ট সমর্থক। সকলেই নিজ নিজ কষ্টিপাথর দিয়ে সাহিত্যকে পরখ করে থাকেন এবং এর ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা করে থাকেন। কিন্তু সাহিত্য স্বর্ণ নয় যার দবদস্তুর করে সত্যিকারের মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

সাহিত্য মনোরম অলঙ্কারস্বরূপ কিন্তু তা স্বর্ণ নয়। তেমনি মনোরম সাহিত্য পত্রিকাগুলি নির্ভেজাল সাহিত্য হতে পারে না এবং সাহিত্যকে সোনার ন্যায় কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে মূল্য যাচাই করা বোকামী মাত্র। সাহিত্য হয় সাহিত্য নচেৎ মারাত্মক কুসাহিত্য। অলঙ্কার দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু আবার অনেক সময় সোনার অলঙ্কারও দেখতে কুশ্রী লাগে। সাহিত্য ও অসাহিত্য অলঙ্কার ও বিশ্রী অলঙ্কারের মাঝে কোন সীমারেখা নেই।

বর্তমান যুগ নতুন উন্মাদনা ও প্রবাহের যুগ। অতীতের বুক ফেটে নতুন যুগের সৃষ্টি হচেছ আর পুরাতন যুগ মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। অন্য-

দিকে নবাগত ক্ষণ যুগ জীবন লাভের আনন্দ' উল্লাসে মেতে উঠেছে। দু-জনেরই মুখ বিষণ্ন। আর দু'জনেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। এই অশ্রুর কালিতে কলম দিয়ে অনেকে লিখেছেন নতুন সাহিত্য। ভাষা একই, সুর একই, তবে পুরাতন স্টাইল বদলে গেছে।

আসলে এই পরিবর্তিত ভাষার স্টাইল ও রীতিকেই আমরা নতুন সাহিত্য, প্রগতিবাদী সাহিত্য, অশ্লীল সাহিত্য অথবা শ্রমজীবীপন্থী সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করে থাকি।

যদি কোন মানুষের মুখের ভাষার উচ্চারণ বা স্টাইল পরিবর্তন হয়, কেউ হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে, কোন রাগিনীর সুর আকস্মিকভাবে বেড়ে যায় অথবা কোন শিশু ছটফট করে কান্না জুড়ে দেয়, তাহলে পরিমাপযন্ত্র দিয়ে এই পরিবর্তনকে যাচাই করা অসম্ভব। বুদ্ধিজীবী ও অনুসন্ধিৎসু লোকেরা সর্বদা এই পরিবর্তন, বৈশিষ্ট্য ও রদবদলকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে থাকেন।

সাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। কোন লেখক যখন লেখার জন্য কলম ধরেন তখন তিনি সাংসারিক রোজনামচা লেখার জন্য বসেন না বা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা উল্লেখ করেন না। তাঁর লেখনীতে কোন ব্যথাতুর বোনের হাসি-কান্না, একটি অবহেলিত দিন-মজুরের হাসি-কান্নাও নিজের হয়ে ফুটে ওঠে। তাই হাসি-কান্না বা অট্ট-হাসিকে নিজের মাপকাঠিতে যাচাই করা ভুল। প্রত্যেকটি সাহিত্য সাময়িকী বা পত্রিকা বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। যদি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রভাবান্বিত হয়ে উক্ত সাময়িকী নিজস্ব আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়, তা হলে তা প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু সাহিত্য এমন ধরনের লাশ নয়, যাকে ডাক্তার তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পোস্টমর্টেম করতে পারেন। সাহিত্য রোগ নয় বরং রোগের প্রতিষেধক। সাহিত্য ঔষধ নয় যার ফর্মুলা বা পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। সাহিত্য দেশ ও জাতির থার্মোমিটার। সাহিত্যই জাতির সবল স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা লঙ্ঘনের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।

পুরাতন আলমিরার একটি ছেঁড়া বই হাতে নিন, দেখবেন অতীত দিনের স্মৃতিকথা আপনার হাতের মুঠোয় ধরা বইয়ের পাতায় ছটফট করছে। বহু শতাব্দী কেটে গেছে ও অনেক বংশধর কালের অতল তলে বিলীন

হয়ে গেছে। মনে হয় যেন মাটির নীচে লাখো লাখো লাশের স্তূপ জমা হয়ে আছে। এই মৃত মানুষের লাশের উপর দাঁড়িয়ে আমরা জীবনের জয়গান গাই। আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন আমরা নক্ষত্ররাজি দেখি, মনে হয় আমরা আকাশের অতি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের একটি সামান্য ওলটপালটের একশতাব্দী পর আমাদের বংশধরেরা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ভাববে তারাই সকলের উর্ধ্বে আছে। প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আদিম যুগের মানুষের কোটি কোটি মৃতদেহ কোথায় কি অবস্থায় মাটি চাপা পড়ে আছে কেউ কি বলতে পারবে? কেউ পারবে না। কিন্তু এখন পৃথিবীর প্রথম মানব আদমের কাহিনী একজন পুরুষ ও নারীর কাহিনী রূপে বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অথবা দুই নারী এক পুরুষ অথবা দুই পুরুষ এক নারীর কাহিনী মাত্র। এই রীতি পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকে মহাপ্রলয় পর্যন্ত চলতে থাকবে।

মানুষের আদিম কালেও ক্ষুধা পেত এখনও পায়। মানুষের ক্ষমতার লোভ লালসা আদিম কাল থেকেই ছিল এখনও রয়েছে। অতএব কিই বা পরিবর্তন হয়েছে? কিছুই না! রুটি, নারী এবং সিংহাসন .. এই তিনটি বস্তু নিয়ে যেন সকলে হিমশিম খাচ্ছে। তবে এই তিনটি বস্তুর চেয়ে যেন ইদানীং ভগবান দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য।

পুরুষ নারীকে ভালবাসলে হির-রাঞ্জার কাহিনীতে পরিণত হয়, রুটিকে ভালবাসলে এপিকিউরাসের দর্শনরূপে আখ্যায়িত হয়। সিংহাসনকে ভালবাসার ফলে মানুষ আলেকজাণ্ডার, চেঙ্গিস, তৈমুর বা হিটলার নামে পরিচিত হন আবার ভগবানের সাথে আধ্যাত্মিক প্রণয় হলে মানুষ মহাত্মা বুদ্ধের রূপ ধারণ করে।

পৃথিবী বিস্তীর্ণ। কেউ পিঁপড়ে হত্যা করাকে পাপ মনে করেন আবার অনেকে লাখো লাখো মানুষ হত্যা করেও নিজের বীরত্ব ও সাহসিকতার বড়াই করে থাকেন। কেউ ধর্মকে আপদ মনে করেন আবার কেউ মহান অবদান মনে করেন। মানুষকে তাহলে কোন্ কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায়? এমনি তো প্রত্যেক ধর্মে মানুষ পরখ করার নিজস্ব কষ্টিপাথর রয়েছে কিন্তু সেই পরিমাপ যন্ত্র কোথায় যা দিয়ে প্রত্যেক জাতি ধর্ম ও জাতের মানুষকে একটি মাত্র কষ্টিপাথরে ঘষে পরখ করা যেতে পারে? এমন দাঁড়িপাল্লা কোথায় যে পাল্লায় তুলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইহুদী, সাদা-কালো সব জাতের মানুষকে ওজন করা যায়?

একে কষ্টিপাথর বলুন বা ধর্মের নিরিখ বলুন কোথাও নতুন বা পুরাতন বলতে কিছুই নেই। মানুষ কেউ প্রগতিবাদী, কেউ উগ্রপন্থী, নগ্ন বা অশ্লীলতা-প্রিয় অথবা পবিত্র হতে পারে না। মানুষকে একমাত্র মানবতার পাল্লায় যাচাই করা সম্ভব অন্য কিছু দিয়ে নয়। আমি এছাড়া কোন দাঁড়িপাল্লার কথা চিন্তাই করতে পারি না এবং অন্য কোন নিরিখের কথা চিন্তা করাই পাপ।

প্রত্যেক মানুষ অন্যকে পাথর নিক্ষেপ করতে চায় এবং একে অন্যের কাজকর্ম যাচাই করতে উন্মুখ। এটাই মানুষের ধর্ম, একে কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার বক্তব্য হল, আপনি যদি আমাকে আঘাত হানতে চান এবং পাথর মারতে চান, তাহলে একটু কায়দা-কানুন শিখে সুন্দরভাবে পাথর নিক্ষেপ করুন।

যারা পাথর বর্ষণের স্টাইল জানেনা, তাদের হাতে আমি মাথা ফাটাতে রাজী নই। পৃথিবীর বুকে বাস করে যদি আপনি নামাজ পড়া, রোজা রাখা আর মজলিসে যাতায়াতের রীতিনীতি শিখে নিতে পারেন, তাহলে আপনাকে অপরের মাথায় পাথর নিক্ষেপের রীতিনীতি শিখে নিতে হবে।

আপনারা আল্লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক ধর্মকর্ম করে থাকেন অথচ আমার সন্তুষ্টি অর্জন কি আপনাদের কর্তব্য নয়? আমি আপনাদের কাছে তেমন কিছু চাই না। শুধু প্রাণভরে আমাকে তিরস্কার সুষ্ঠুভাবে করুন যেন আপনার মুখ তিক্ততায় ভরে না ওঠে অথবা আমার অনুভূতি আহত হয়।

আমার কাছে এই রীতিই কষ্টিপাথর। মানুষের সকল কর্মতৎপরতা, পাপ, পুণ্য, কবিত্ব, গল্প প্রভৃতির ব্যাপারে তথাকথিত নামকরা সমালোচকদের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। সমালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের দ্বারা কাগজের কলাম নষ্ট হয়, একে দিয়ে ফুল তৈরী করা যায় না।

বহু সমালোচক এ মরজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু সাহিত্য থেকে অসাহিত্যিক পরিবেশ দূরীভূত হয়নি। বহু পয়গম্বর এই দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন কিন্তু মানুষ পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি বরং ঝগড়া-বিবাদ

লেগেই আছে। এটা কম বেদনাদায়ক নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটাই মানুষের ভাগ্য, কেননা মানুষের অদৃষ্টে এই দুঃখ-বেদনাই লেখা। মানুষের জীবন, মৃত্যু, যৌবন, বার্ধক্য সবকিছুর মাঝেই এই ট্র্যাজেডী নিহিত। এই ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি সা'দত হাসান মাণ্টো, আপনি ও সমগ্র বিশ্ব। এখানে কষ্টিপাথর অনেক কিন্তু পাথর ঘষার লোকের অভাব। পাথরের সংখ্যা অল্প কিন্তু পাথরে মাথা ঠুকে মরার লোকের অভাব নেই।

আমার অভিযোগ

আমার অভিযোগ ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে, যারা উর্দু ভাষার সেবক হয়ে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন আর মানুষের কাছ থেকে তাদের এই সেবার মূল্য আদায় করে নিচ্ছেন। অথচ যাদের লেখনীর কল্যাণে তাদের আয় বেড়ে যাচ্ছে, সেই লেখকদের তারা দু'পয়সা দিতে নারাজ।

আমার অভিযোগ সেই সব সম্পাদকের বিরুদ্ধে, যারা নিজেরাই পত্রিকার মালিক। তারা লেখকদের কল্যাণে ছাপাখানার মালিক হয়েছেন, কিন্তু লেখকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার কথা শুনলেই তাদের প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়।

আমার অভিযোগ সেই সব পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, যারা শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য পত্রিকা বের করেন আর তাদের পত্রিকার সম্পাদককে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা বেতন দিয়ে থাকেন। পত্রিকার আয় দিয়ে পুঁজিপতিরাতো সুখেই কাল কাটান, কিন্তু যার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার দরুন তাদের সম্পদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, সেই বেচারাকে জীবনের আনন্দ ও সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়।

আমার অভিযোগ সেই সব প্রকাশকের বিরুদ্ধে, যারা জলের দামে পাণ্ডুলিপি খরিদ করে নিজের জন্য হাজার হাজার টাকা আয় করে নেন। তারা সহজ সরল লেখকদেরকে অবস্থার বিপাকে ফেলে তাদের রচনাবলী হাতিয়ে নেবার সুযোগে থাকেন আর তাতে সাফল্য লাভ করেন।

আমার অভিযোগ সেই সব মূর্খ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে, যারা টাকার লোভ দেখিয়ে গরীব লেখকদের লেখা আর চিন্তাধারা নিজের নামে প্রকাশ করে থাকেন।

আমার সব চাইতে বড় অভিযোগ সেই সকল সাহিত্যিক, কবি ও গল্প-কারদের বিরুদ্ধে, যারা বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের লেখা পত্রিকায় পাঠান।

তারা কেমন করে এমন একটি বস্তুর লালন করেন, যা তাদের মুখে একটি ঘাসের পাতাও তুলে দেয় না। তারা কী করে এমন একটা কাজ করেন, যার দ্বারা তাদের নিজস্ব কিছুই লাভ হয় না। তারা কিসের জন্য এই কাগজগুলিতে আঁকাজোঁকা করেন, যা কিনা পরিণামে তাদের জন্য কাফনের কাপড়ও জোটাতে পারে না।

আমার অভিযোগ—আমার অভিযোগ—আমার অভিযোগ সে সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে, যা আমাদের লেখনী ও আমাদের পারিশ্রমিকের মধ্যে বাধা হয়ে আছে। আমার অভিযোগ আমাদের সাহিত্যের বিরুদ্ধে, যার চাবিকাঠি কিছু সংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত। সে চাবিকাঠি আর কিছু নয় – ছাপাখানা। আর ছাপাখানার উপর কতিপয় লোভী পুঁজিপতির অবাধ আধিপত্য। তারা ব্যবসায়ী মাত্র, সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সেই পরিমাণে শিথিল, যে পরিমাণে ব্যবসার সাথে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান। আমার সম পেশাধারী লেখকদের বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ, যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকেন। তাদের বৈধ অবৈধ সকল প্রকার চাহিদা তারা তাদের মাথার ঘিলু নিংড়িয়ে বের করে দেন। আমার অভিযোগ—আমার নিজের বিরুদ্ধেও। কারণ আমার জ্ঞানচক্ষু বেশ দেরিতে ফুটেছে। অনেক দেরি করে আজ আমি এ বিষয়ে কিছু লিখতে বসেছি। অথচ অনেক আগেই এ সম্পর্কে লেখা উচিত ছিলো।

হিন্দু, হিন্দুস্তানী আর উর্দু হিন্দীর ঝগড়ার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা চাই আমাদের মেহনতের মজুরী। লেখা আমাদের পেশা। তাহলে কেন আমরা এর মাধ্যমে বেঁচে থাকার জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার দাবি করবো না? যে সকল পত্র-পত্রিকা আমাদের লেখার কোন মূল্য দিতে পারে নি—সেগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। এ ধরনের পত্র-পত্রিকার দেশের কোন প্রয়োজন নেই। সাহিত্যের তো কথাই ওঠে না।

দেশের জন্য আর সাহিত্যের জন্য লেখকের প্রয়োজন আর লেখকের জন্য সে ধরনের পত্র-পত্রিকা থাকা দরকার, যা তাদের লেখার মূল্য দিতে পারে। পত্রিকা প্রকাশ করা কোন প্রকার স্বেচ্ছাসেবকের কাজ নয়। ঐ সকল লোক, যারা ভাষা ও সাহিত্যের কথা ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে থাকে, আমার কাছে তাদের কোন মূল্য নেই। কারণ কাগজের পৃষ্ঠা ভরে কালির দাগ ছড়ালেই সাহিত্যের খেদমত হয় না। প্রত্যেক মাসে এক বোঝা মুদ্রিত কাগজ

পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরলেই সাহিত্যের সুনাম বাড়ে না। সাহিত্যের যথার্থ সেবা হতে পারে কেবল মাত্র সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ্‌দের উৎসাহ বর্ধনের মাধ্যমে। আর এ উৎসাহ বর্ধন তাহাদের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদানের উপরই নির্ভর করছে।

কিছুদিন পূর্বে আমি আমার একটি রচনা হিন্দুস্তানের এমন একটি মাসিক পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম, যার আয় দিয়ে আমার ন্যায় পঁচিশজন লেখকের অসহায় অবস্থা দূর হতে পারে। রচনাটির সাথে আমি একটি পত্রও দিয়েছিলাম, যার মর্ম এই ছিলো যে, লেখাটি আমার যথাযোগ্য পারিশ্রমিক না দিতে পারলে তা যেন উক্ত পত্রিকায় ছাপা না হয়। বরং ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটি আমার আগে থেকেই জানা ছিলো, তাই লেখাটি সসম্মানে ফেরত এসেছে। তার সাথে সম্পাদকের একটি পত্রও পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, যেহেতু যুদ্ধের জন্য নানা ধরনের খরচ অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে, সেজন্য খরচের পরিমাণ কমাতে গিয়ে পত্রিকার মালিকেরা লেখকের পারিশ্রমিক বন্ধ করে দিয়েছেন।

এ পত্র পড়ে আমার মনে হয়েছে, আমি এর একটা উত্তর এভাবে লিখি—'আমার খুবই আক্ষেপ হচ্ছে যুদ্ধের জন্য আপনাদের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়ে পড়েছে, যাতে করে লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমার মত হলো, পত্রিকাটাও বন্ধ করে দিন। অনর্থক খেসারত দেওয়ার কি দরকার। যুদ্ধ শেষ হলে যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে তখন আবার পত্রিকা প্রকাশ করবেন।'

আমি আবার বলছি, আমাদের এখানে এ ধরনের পত্রিকার অস্তিত্বই থাকা উচিত নয়, যার পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্ভট অজুহাত প্রচার করা হয়। আসলে এ ধরনের পত্রিকায় দেশের প্রয়োজনটাইবা কী! আমার মত হলো, যে ভাবেই হোক, এদের প্রচার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া দরকার। এর স্থলে সে সব পত্রিকার সমৃদ্ধি ঘটা দরকার, যারা সাহিত্যিকদের যথাযোগ্য পারি-শ্রমিক দিতে কার্পণ্য করে না। আমাদের সাহিত্যের জন্য দশ হাজার পত্রিকার প্রয়োজন নেই। এমন দশটি পত্রিকা হলেই চলে, যা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যে পত্র-পত্রিকা আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, বলতে পারেন সেগুলি কোন্ রোগের দাওয়াই? আমরা কিসের জন্য সেগুলিকে টিকিয়ে

রাখতে চেষ্টা করবো, যারা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না!

প্রবন্ধ রচনা মস্তিষ্কের বিলাস নয়। গল্প লেখা দাতব্য হাসপাতাল নয়। আমাদের মগজটা লঙ্গরখানা নয়। আমরা সেই যুগকে মাথা থেকে পাও পর্যন্ত বিস্মৃতির অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করতে চাই যে যুগে কবিরা ভিক্ষা করে পেট পালতো আর লেখার বিলাস তাদের জন্যই ছিলো, যাদের ঘরে পেট পুরে খাবার সামগ্রী ছিলো অঢেল!

আমরা নতুন যুগের নতুন নিয়মের বার্তাবাহী। আমরা অতীতের ধ্বংস-স্তূপের উপর ভবিষ্যতের বিরাট সৌধের সুদৃঢ় প্রাচীর তৈরীর কাজে নিয়োজিত রাজমিস্ত্রি। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। আমাদের পথে বাধার পাহাড় জমে ওঠা উচিত নয়। আমরা খালি পেট আর খালি পা থাকতে পারবো না। আমাদেরকে লেখনীর সাহায্যে জীবিকা অর্জন করতে হবে আর আমরা তা করবোই। এটা কখনোই হতে পারে না যে, আমাদের বালবাচচারা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে আর আমাদের লেখা বুকে নিয়ে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পাবে, তাদের মালিকরা সুখে-শান্তিতে বাস করবে।

আমরা সাহিত্যিক, চানাচুর বিক্রেতা নই, আমরা গল্পকার, তরকারী বিক্রেতা নই, আমরা কবি, মেথর নই। আমাদের প্রতি দুনিয়ার যথাযোগ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। আমরা তারকার সাথে কথা বলি, আমরা এমন কথা কখনো শুনতে রাজী নই, যা আমাদেরকে হীনতা ও নীচতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমাদের মর্যাদা ঐ সকল লোকের চাইতে সব দিক দিয়েই উন্নত, যারা শুধু টাকা গণনা করতেই জানে। আমাদের অবস্থা ঐ সকল লোকের চাইতে বহুগুণ উচেচ, যারা কোন কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না, ধ্বংসও করতে পারে না।

আমরা সাহিত্যিক, গাল্পিক, কবি সৃষ্টিও করতে পারি, ধ্বংসও করতে পারি। আমাদের হাতে আছে লেখনী, যা জাতির সুপ্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে দিতে পারে, এক মুহূর্তে বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের মহিমা স্বীকার করে নিতে হবে। স্বীকার করতে হবে সেই সকল লোককে, যারা আমাদের সাথে মিলে-মিশে জীবন যাপন করছে। আমাদের অর্থাৎ হিন্দুস্তানীদেরকে এক বিশেষ স্থান নির্ধারণ করতে হবে, যেখানে বসে আমরা আরামের সঙ্গে কাজ করতে পারি।

আমরা চাই আমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। আমরা রাজ-মুকুট বা রাজত্ব চাই না। আমরা ভিক্ষার ভাণ্ড নিয়েও বেড়াতে চাই না। আমরা মণি মাণিক্যের স্তূপও চাই না। আবার আমরা ছ্যাবলা ভিখারীও নই। আমরা চাই মানুষের মত বেঁচে থাকতে। কারণ আমরাও মানুষ।

আমাদের সম্মুখে সে সকল দরজা কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার মধ্য দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে যাবো। দরজাগুলি বন্ধ করে দিয়ে আবার এ ধরনের কান্নাই বা কেন কাঁদা হয় যে—'আমাদের সাহিত্য খুবই অনগ্রসর—এর উন্নতি হয় না কেনো—আমাদের লেখকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।' লেখকের আবির্ভাব হবে কী করে। সাহিত্যের উন্নতিই বা হবে কী করে। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক প্রদেশ থেকে হাজার হাজার পত্র-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করছে। প্রতিটির কপালেই সাহিত্য সেবার তিলক পরানো অথচ এগুলি আসলে কাগজ নয়, কাগজী ভিক্ষাভাণ্ড মাত্র। যার মধ্যে আমাদের ন্যায় লোকদেরকে ভিক্ষা দিতে বলা হয়। এ ধরনের ভিক্ষাভাণ্ড থাকা উচিত নয়। এগুলি থেকে সাহিত্যের অঙ্গনকে পবিত্র রাখতে হবে আর তা এখনি করতে হবে, আজই, এই মুহূর্তে।

আমি আমার সম পেশাধারী ভাইদের সকলকে বলছি, যাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বনের কিছু মাত্রও অবশিষ্ট আছে, তারা যেন ঐ সকল পত্রিকার সম্পর্ক ত্যাগ করেন, যা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে কার্পণ্য করে। আজই আমাদেরকে ঐ সমস্ত পত্র-পত্রিকার অস্তিত্ব অস্বীকার করা উচিত। ওরা বিনা পুঁজিতে মুনাফা লুটতে চায়। এ সকল পত্রিকা আর মাজারগুলির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেখানেও পাণ্ডারা সব সময় নজর নিয়াজের জন্য হাত পেতে বসে থাকে। আমাদের জন্য এ জাতীয় মাজার আর এ ধরনের পত্র-পত্রিকার কোনো দরকার নেই, যা দিয়ে আমাদের কোনো উপকার হয় না।

পত্রিকা নামক কাগজের পোঁটলা যেখানে ছাপা হয়, সেই প্রেসকে পয়সা দেওয়া হয়। লিথু ছাপার লিপিকারদেরকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যে সকল মজদুর ঐ পত্রিকাগুলি এখান থেকে ওখানে বহন করে নিয়ে যায়, তাদেরকে দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক হারে বেতন দেওয়া হয়। কিন্তু যারা ঐ পত্রিকার লেখক তাদেরকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এর চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হতে পারে!

লেখকের জৈবিক প্রয়োজন বলতে কি কিছু নেই ? তার কি ক্ষুধা পায় না ? তার কি পরনের কাপড়ের দরকার নেই ? সে কি মানুষ নয় ? যদি সে মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতি এ ধরনের পশুসুলভ ব্যবহারের কি অর্থ থাকতে পারে ?

আমি চাই বিদ্রোহ। সেই সকল লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যারা আমাদের দ্বারা পরিশ্রম করায় অথচ তার পারিশ্রমিক আদায় করে না।

আমি চাই বিদ্রোহ, সাংঘাতিক ধরনের বিদ্রোহ, যাতে করে আমাদের সাহিত্যের অবদান থেকে এই প্রকার অভিনব ক্রিয়াকাণ্ড সমূলে দূরীভূত হয়ে যায়, যার প্রভাবে লেখক তার রচনার দাম চাইতে সংকোচ বোধ করে থাকে, আমি সেই আবরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চাই, যা কিনা আমাদের পুঁজিপতিরা দীর্ঘদিন ধরে লেখকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন স্বার্থ সাধনের জন্য। এই আবরণের ফলে যে চেতনা লেখকদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, আমার বিদ্রোহ সেই চেতনার বিরুদ্ধে। এই চেতনার জন্যই লেখকরা মনে করেন, লেখালেখি ব্যাপারটা নিছক একটা নেশা আর এ নেশা অকর্মণ্য লোকেরাই করে থাকে।

সাহিত্যের উন্নতি লেখকের হাতে, সেই সকল লোকের হাতে নয়, যাদের কাছে ছাপার মেশিন কালি আর অসংখ্য কাগজ বিদ্যমান। সাহিত্যের প্রদীপ আমাদের মগজের তেল দিয়েই জ্বলে, সোনা-রূপার দ্বারা যে প্রদীপ জ্বালানো যায় না। যদি আজ আমরা—কবি, গাল্পিক আর প্রাবন্ধিকরা হাত থেকে কলম রেখে দিই, তাহলে পত্র-পত্রিকার কপালে সৌভাগ্যের তিলক কোনো কিছুতে জুটবে না।

যদি আমরা লেখাটাকে একটা মর্যাদাশালী পেশা রূপে গড়ে তুলতে চাই, যদি আমাদের মর্যাদা বিরুদ্ধবাদীদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদেরকে লড়তে হবে। আমাদেরকে এক বিরাট যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের হরতাল করতে হবে। আমাদের চিন্তার আর ভাবনার হরতাল, আমাদেরকে ঐ সময় পর্যন্ত নিজেদের উপলব্ধি আর উচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে রাখতে হবে, যখন পিপাসার চোটে পত্রিকাগুলির জিহ্বা লটকে পড়বে, খিদের জ্বালায় তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

এসো আমরা একটা সংঘ গড়ে তুলি। আমরা সকলে মিলে এক হয়ে যাই। যদি আমরা সকলে মিলে আমাদের কলমগুলি এক স্থানে রাখি, তাহলে একটা পাহাড় গড়ে তুলতে পারি। তবে কেনো আমরা একে অন্যে

মিলে এই অদ্ভুত আচরণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবো না। এযে আমাদের মর্যাদার কপালে এক বিশ্রী কলংক। আমরা সমাজে আমাদের জন্য একটা স্থান চাই। আর এতোটুকু চাই যেন আমাদের লেখার যথার্থ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। আমাদেরকে যেন তেমন সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়, যা পাবার যোগ্যতা আমাদের রয়েছে। আমাদের এ দাবি সম্পূর্ণ বৈধ। যদি তাই হয়, তাহলে আজ থেকেই আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করবো না কেন ?

আর কতদিন সাহিত্যিককে একজন অকর্মণ্য লোক বলে মনে করা হবে ? কতদিন কবিকে একজন আষাঢ়ে গল্পের কথক বলে ভাবা হবে? আর কতোদিন সাহিত্যে কতগুলি স্বার্থপর, লোভী লোকের আধিপত্য বিরাজ করবে। কতোদিন ? আর কতোদিন ?

আমি উপরেও বলেছি, আমার অভিযোগ সে-সব লেখক ভাইদের বিরুদ্ধে, যাদের লেখায় অন্যদের পেট ভরে, কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য একটা আধলাও ঘরে আনে না, তারা প্রবন্ধ রচনা করে ; অন্য কোনো কৌশলে নিজের পেট-ভরে নিয়ে কবিতাও লেখে আর অন্য কোনো কুয়া থেকে নিজের পিয়াসা মিটিয়ে গল্পও সৃষ্টি করে। কিন্তু হায়, তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোনো না কোনো কাজ করতেই হয়। জুলুমের উপর জুলুম আর কাকে বলা যায়, তাদের এই লেখাই কবিতা গল্পের আকারে কাগজের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে অন্যের পেট ভরায় অন্যের পরনের কাপড় যোগায়। অথচ সে নিজে এর বদলা একটা আধলাও পায় না। এমনটা হওয়া উচিত নয়, এমন আর হবেও না।

আমাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে আর এ আমরা ঘটিয়েই ছাড়বো। এমন একটা বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে, যাতে অবস্থার পরিবর্তন আসে। সাহিত্যিক নিজের কলম দিয়ে রুজি কামাবে, এই নীলাকাশের নীচে অন্য দশটা লোকের মত খোদার দেওয়া নেয়ামত ভোগ করবে আর মানুষও তাদের পেশাকে সম্মানের চোখে দেখবে।

সময়ের পরিবর্তন ঘটছে। আমরাও অবস্থার পরিবর্তন করি। আর তা করতে গিয়ে সে সব অদ্ভুত আচার-আচরণ এক ঝটকায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিই, যা আমাদের উপর অনর্থক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসো, আমরা এক মর্যাদাপূর্ণ জীবন ও মরণের কামনা করি। আমাদের জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে

একটা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার কারণ আমরা যথার্থই মহান। আমরা সাহিত্যিক, আমরা গল্পকার, আমরা কবি। আমাদের হাতে আছে কলম, যা তরবারীর চাইতেও শক্তিশালী।

বন্ধুরা, অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। আর তা এতদূর গড়িয়েছে যে, অনেক লেখকই দোকান খুলে বসে গেছে। তারা সেখানে ক্রেতাদের নিকট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ বিক্রি করে থাকে। আট আনা হলে একটি গজল পাওয়া যায়। বিশ টাকায় একটি উপন্যাস আর একটি ছোট গল্পের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। এ ধরনের কয়েকটি দোকানের বিজ্ঞাপন আপনারা পত্রিকায় পড়েছেন। এ সকল বিজ্ঞাপনের মূল্যও ঐ লেখকেরা গজল আর গল্প দিয়ে শোধ করে। এসব কিছু এজন্যই হতে পারছে যে আমরা সবাই নিজেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা নিজেদের মর্যাদা খাট করে রেখেছি।

কিন্তু এ অবস্থা এক মিনিটে বদলে যেতে পারে। তুড়ি মেরে আমরা আমাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে পারি। খুব অল্প সময়েই আমরা আমাদের জন্য একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারি—যার মধ্যে আমাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা থাকবে। আপনারা কী মনে করেন?

আমি বলি, ওঠো, নিজের ঘুমন্ত ভাইদেরকে ধাক্কা দাও। তাদের কানে আমার একথা পৌঁছিয়ে দাও। এক ঝাণ্ডার নীচে সকলে সমবেত হয়ে যাও। নিজেদের জন্য একটি সংঘ গড়ে তোলো আর লড়াই শুরু করে দাও। তোমাদের কলমগুলি কিছুদিনের জন্য কালিতে ভিজিও না, দেখবে পত্রিকার জগৎ তোমাদের পায়ের উপর এসে গড়িয়ে পড়বে।

কাফনের জামা

মন চায় সব ফর্মালিটি বাদ দিয়ে পাঠকদের সাথে মন খুলে আলাপ করতে। তাছাড়া আমার ছোট গল্প, নাটক আর আধা-গল্প জাতীয় নিবন্ধে মানবিক দিকটাই বেশী প্রতিভাত করে তুলেছি। যেহেতু গল্পেই আমি মানুষের আসল রূপটাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি তাই আপনাদের কাছে আমার গল্প অধিক প্রিয়।

আজ আমার হৃদয় অত্যন্ত বিষণ্ণ। এক বিচিত্র অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আছে সারা হৃদয়ে। বহুদিন আগে আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমি বোম্বাইকে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছি।

বোম্বাই ত্যাগ আমাকে সবচেয়ে বেশী ব্যথা দিয়েছে। কেননা সেখানে আমি জীবনের মূল্যবান সময় কাটিয়েছি। আমার মত ভবঘুরে ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষকে তার বুকে স্থান দিয়েছিল। বোম্বের পথের ধূলিকণা আমাকে কানে কানে বলেছে, "তুমি এখানে দু পয়সা অথবা দৈনিক দশ হাজার টাকা উপার্জন করে সুখী থাকতে পার। অন্যথায় দশ হাজার টাকা উপার্জন করেও জীবনকে দুর্বিষহ করতে পার। এখানে যা খুশী তা করো কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। এখানে কোন সহযোগী পাবে না। সকল দুরূহ কাজ তোমাকেই সমাধা করতে হবে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। তুমি ফুটপাতে থাক অথবা রাজপ্রাসাদে তাতে কিছু আসে যায় না। তুমি থাক অথবা চলে যাও কোন পার্থক্য হবে না। আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব।"

বোম্বেতে ১২ বছর বসবাস করে আমি যা শিখেছি তারই বদৌলতে আজ টিকে আছি। আমি যেন একটি ভ্রাম্যমাণ বোম্বাই শহর। যেখানেই আমি থাকব সেখানেই নিজস্ব জগৎ প্রতিষ্ঠিত হবে।

বোম্বে ত্যাগের জন্য আমি বেদনায় ভারাক্রান্ত। সেখানে আমার বন্ধু-বান্ধব ছিল তাদের জন্য আমি গর্বিত। সেখানে আমার বিয়ে হয়েছে, আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। আমি বোম্বেতে কয়েক টাকা থেকে শুরু করে হাজার ও লাখো টাকা উপার্জন করেছি এবং খরচ করেছি। আমি বোম্বেকে ভালবাসতাম এখনও বাসি।

আমি একজন মানুষ। সেই মানুষ যারা মানবতার শ্লীলতা হানি করেছে। এরাই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মাদক রস পানে উন্মত্ত হয় এবং অন্যান্য পণ্যের ন্যায় মানুষের দেহ দোকানে সাজিয়ে রেখে বেসাতী চালিয়ে থাকে।

আমি এমনি মানব জাতির বংশধর যারা পয়গম্বরের মর্যাদায় আসীন, আমার মহাপুরুষকে হত্যা করে এরাই নিজের হাত কলঙ্কিত করেছে। সাধারণ মানুষের সকল গুণাবলী ও দুর্বলতা আমার মাঝে রয়েছে। বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই খুব ব্যথিত হয়েছি কারণ আমার একজন সহযোগী অভিযোগ করেছেন, আমি নাকি লাশের পকেট থেকে সিগারেটের টুকরা, আংটি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বের করে জমা করছি। অনেকে আমাকে অতি বিপ্লবী, তর্কবাগিশ ও প্রগতিবাদী প্রভৃতি উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন। সহযোগী আমার নামে একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন যা তিনি অনায়াসে আমার হাতে দিতে পারতেন।

যেহেতু আমি রক্তমাংসের গড়া মানুষ। তাই আমার রাগ হয়েছে। এই কাদা ছোড়ার জবাবে নিজেও ঢিল ছুঁড়তে পারতাম এবং বড়া জবাব দিতে পারতাম যা সমালোচকদের দীর্ঘদিন মনে থাকতো। কিন্তু আমি এটাকে ভুল পদ্ধতি বলে মনে করি। ইটের প্রত্যুত্তর পাথর দিয়ে দেয়া মানুষের স্বভাব এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চুপচাপ থাকা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে এবং সেটাই তার সহনশীলতা।

সহযোগী আমাকে ভুল বুঝেছে এজন্য আমার কোন দুঃখ নেই কিন্তু শাসনের খাতিরে সুপরিকল্পিতভাবে বিদেশী রাজনীতির কৃত্রিম মুখোস পরে অনেকে আমার সততার উপর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমাকে এমন কষ্টিপাথরে যাচাই করা হয়েছে যেখানে ইটই সোনা বলে ধরা হয়।

তাই আমার রাগ হয়েছে; জানিনা এদের কি হয়েছে। এরা কি ধরনের 'প্রগ্রেসিভ' যারা পশ্চাদের দিকে ধাবিত হয়। এদের 'রক্তিমতা' যেন কালো কালির ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরা এমনিই শ্রমিকের বন্ধু

যে শ্রমিকের গায়ের ঘাম বহির্গত হওয়ার পূর্বেই তাদের দাবী আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা নিজেরাই পুঁজি পুঞ্জিভূত করছে আর নিজেদের বন্দুক কুড়াল-হাতুড়ী প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছে। তাদের সাহিত্যে এটা কি ধরনের রীতি জানিনা যে, তারা গজলকে মেসিন এবং মেসিনকে গজল হিসেবে চালিয়ে দেবার পরিকল্পনা তৈরী করছে।

তাদের সভা সমিতিতে পঠিত দীর্ঘ প্রস্তাব সমূহ দেখে আমার রাগ হয়। কারণ তাদের বিবৃতির বিষয় বস্তু রাশিয়ার ক্রেমলিন থেকে বোম্বের ক্ষেত খামারে এসে সমাপ্ত হয়। সোভিয়েত কবি অমুক কথা বলেছে, সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী অতি ভাল কথা বলেছে ইত্যাদি...... । আমার রাগ হয় এ জন্য এখানকার লেখক কবিরা কেন নিজ দেশের মাটি মানুষের কথা বলে না। যেখানে তারা বাস করে আর সেখানকার আলো বাতাস মাটিতে তারা বড় হয়েছে। আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবিদের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিলে তা অতি প্রগতিবাদী হয়ে ঘুচবে কি?

আমার দুঃখ আমার কথা কেউ শোনে না। দেশে একটা বিরাট পরিবর্তনের পর লোকেরা বাড়ী-ঘর দখল ও বরাদ্দ নিয়ে ব্যস্ত? কেউ এক মুহূর্তের জন্য একথা ভাবে না যে, এত বড় একটা বিপ্লবের পর পরিস্থিতি আগে যেমন ছিল তেমনি থাকতে পারে না। এখন কেউ বলতে পারেন না, বিদেশী সরকার ও আমাদের নিজস্ব সরকারের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হবে। তদুপরি সে ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা করাও ঠিক নয়। রাষ্ট্র ও সরকার এবং জনগণের সম্পর্ক নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন। বিদেশী নীতি বা আদর্শ অনুকরণে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তাড়াহুড়া করে কাজ করেছেন এবং নিমের রস সকল পেয়ালায় ঢেলে দিচ্ছেন চিরঞ্জীব হওয়ার জন্য। যথাযথ দেখাশুনার অভাবে এই রস পচতে শুরু করেছে।

সাহিত্যের এই প্রগতিবাদী ঠিকাদাররা সরকারী পত্রিকায় কাজ করবে না লিখবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। আমি এর বিরোধিতা করি এবং তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও হাস্যকর ব্যাপার। কেননা সরকার পছন্দসই বস্তুগুলি বাছাই করে নেবেন অন্যকিছু নয়। তাছাড়া প্রগতিবাদী লেখকগোষ্ঠীর অনেকে এই সিদ্ধান্তে অবিচল নাও থাকতে পারে।

সরকারও হাস্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যেহেতু প্রগ্রেসিভ লেখক গোষ্ঠী ঢাকঢোল পিটাচ্ছে তাই বেতার ও সরকারী পত্র-পত্রিকায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়। অনেক লেখককে নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ করা হয়। বোকামীর পরিচয় দিলেন সরকার।

রাগের বশে এদের জেলে নিক্ষেপ করেন সরকার। এই ব্যাপারে সরকার একবার ভেবেও দেখেননি। জেল থেকে বেরিয়ে এইসব লেখকদের আগেকার রূপ থাকবে কিনা? মাথা মুড়ানো থাকবে না দাড়ি গোপ ও চুলে ভর্তি থাকবে। তাদের গাজী আখ্যা দেয়া হবে না শহীদ। তারা কি নেতা বনে যাবেন রাতারাতি নাকি বাজারে ফেরী করে লোক জড়ো করে ওষুধ বেচবেন। নতুবা কবিতা ও গল্প লেখা একেবারেই ভুলে যাবেন। এর চেয়ে অধিক কিছু ঘটতে পারে। আমার নিজের ব্যাপারেও একই অবস্থা হত এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা আমি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ লোক।

সরকার ও প্রগ্রেসিভ লেখকগোষ্ঠী দু'দলই হীনমন্যতায় ভুগছেন। এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্রগ্রেসিভ লেখক গোষ্ঠী রাজনীতির আড়ালে সাহিত্য ও রাজনীতির হালুয়া তৈরীর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। যে রোগীর জন্য এই হালুয়া তৈরী করা হচ্ছে তার দেহের ও নাড়ীর খবর কেউ রাখেনি। পরিণামে কি হয়েছে তা সকলেই জানেন। ইদানীং সকলেই সাহিত্যের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করছে।

আমার হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত; কেননা যে সকল লেখক সরকারকে সমর্থন না জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কথা ভাবছেন। তাঁরা কখনও একথা ভাবেননি যে, মানুষের বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্যে পেটের জন্য সংগ্রামই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের যৌবনকে চাপা দেয়া যায় ক্ষণিকের জন্য; উন্মত্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সত্য কিন্তু পেটের ক্ষুধা কোন মতেই নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়। এই পেটের জন্য আমাদের অনেক সময় অযোগ্য লোকেরও প্রশংসা করতে হয়। এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী। কিন্তু এই ট্রাজেডীর অপর নাম মানব জীবন। আমার সব রাগ এখন বেদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমি বেদনায় ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত। যা কিছু দেখেছি এবং দেখছি তাতে আমার বেদনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বর্তমান জীবন অত্যন্ত বেদনা-

বাহক। রাতদিন পরিশ্রমের পরও যা আয় করি তাতে আমার জীবিকা নির্বাহ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই অনুভূতি আমাকে রাতদিন যক্ষ্মার ন্যায় গ্রাস করে চলেছে। আজই আমি চোখ বুজলে আমার স্ত্রী ও তিনটি শিশু কন্যার কি হবে? তাদের দেখাশুনা কে করবে? আমি অশ্লীল লেখক জেদী ও তর্কবাগিশ সত্য কিন্তু একজন স্ত্রীর স্বামী ও তিনটি মেয়ের পিতা। এদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যখন ওষুধ কেনার টাকার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিতে হয় তখন অত্যন্ত ব্যথা পাই। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা অত্যন্ত গরীব। অভাবের সময় তাদের সাহায্য করতে না পারলে সত্যি কষ্ট হয়। অর্থের জন্য নিজেকে বা অন্য কাউকে মানুষের কাছে মাথা নত করতে দেখলে বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যখন বেতার ও পাঠাগারের দরজা আমার রচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমাকে বিশিষ্ট লেখকদের সমতুল্য মর্যাদা দেয়া হবে তখন আমার আত্মা অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়বে। বরং বেঁচে থাকলে তা সহ্য করা সম্ভব কিন্তু মৃত্যুর পরে এই অমর্যাদা আমার অকল্যাণকর। আল্লাহ্ এই আপদ থেকে আমাকে যেন মুক্ত রাখেন।

আমার দুঃখ হয় যখন অনেককে বলতে শুনি যে, সাহিত্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের আশংকা "ইসলাম বিপন্ন" নামক শ্লোগানের সমতুল্য। সাহিত্য সর্বদা গতিশীল তা কখনও স্থির হতে পারে না। যেমন 'এটম'-এর শক্তি আবিষ্কারের পূর্বেই তা অনু-পরমাণুতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তার যথেচ্ছা ব্যবহার ও ভুল ব্যবহারের জন্য "এটম"কে দায়ী করা যায় না।

সাহিত্য সজীব ও গতিশীল রয়েছে, থাকবে; তাতে স্থবিরতা দেখা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের আলসেমিকে সাহিত্যে দেখতে পাই স্থবির আকারে।

নিশ্চল ও অচল কি তা আমাদের নিজেদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে হবে। সাহিত্য সঠিক পথে চলেছে। আমরা যদি বিচ্যুত হই তা'হলে এর জন্য সাহিত্যকে দোষারোপ করা যায় না। রাজনীতির পথ ও মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাছাড়া সাহিত্য ও শিল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাজনীতিকে পাথেয় করা ভুল।

সাহিত্যে কারও ইজারাদারী নেই। সাহিত্য কাউকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সাহিত্যে 'গতিহীনতার' ধোঁয়া তোলা 'ইসলাম বিপন্ন' শ্লোগানেরই নামান্তর মাত্র।

আমি আজ বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রথম দিকে আমাকেও প্রগতিবাদী লেখক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরে আমাকে বিপ্লবী বলে ফতোয়া দেয়া হয়। এখন তারা আবার আমাকে প্রগতিবাদী লেখক হিসেবে চিহ্নিত করার কথা ভাবছেন। অর্থাৎ আমি একজন কম্যুনিষ্ট। অনেক সময় সরকার আমার বিরুদ্ধে অশ্লীল লেখনীর অভিযোগে মামলাও দায়ের করেছেন। আবার এই সরকারই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন সা'দত হাসান মান্টো দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও গল্প লেখক। তার লেখনী সর্বদা সচল ও প্রোজ্জ্বল রয়েছে। আমার বেদনাতুর হৃদয় কেঁপে উঠে যখন ভাবি সরকার আবার আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যদি আমার কাফনে 'তমগা' ঝুলিয়ে দেন। তাহলে আমার ভালবাসার স্মৃতিচিহ্নের প্রতি দারুণ অবমাননা করা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আধুনিক সাহিত্য

[বোম্বে যোগেশ্বরী কলেজে কতিপয় সাহিত্যিক নূতন সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। মান্টোকে পরবর্তী আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানান হয় এবং তিনি সাদরে তা কবুল করেন এবং নতুন সাহিত্য সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। ১৯৪৪ সালে লাহোরের বিশিষ্ট কবি ও লেখক আহমদ নদিম কাসমী সম্পাদিত উর্দু মাসিক 'আদব ও লতিফের' বার্ষিক সংখ্যায় "গন্ধ" গল্পের সাথে মান্টোর এই ভাষণটিও প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাব সরকার ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া আইনের ৩৮ ধারা মোতাবেক মান্টোর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সরকারী অভিযোগ হল রাজকীয় বৃটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে যা সেনাবাহিনীর পক্ষে মর্যাদা হানিকর। এই মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য মান্টো কয়েকবার বোম্বে থেকে লাহোর আদালতে উপস্থিত হন। নানা ঝামেলা পোহানোর পর লাহোর দায়রা আদালতে মান্টো বেকসুর খালাস পান।]

আমার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আধুনিক সাহিত্য! মজার ব্যাপার হল আমি আধুনিক সাহিত্যের অর্থ কি বুঝিনা। বর্তমান যুগে মানুষ যে বিষয়ে কিছুই জানেনা তা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। কিছু দিন আগে গান্ধীজী আগা-খানের বাড়ীতে আমরণ অনশন শুরু করেন। তাঁকে কি ভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় তা বোধগম্য হয়নি। অবশেষে কমলা আবিষ্কার করা হয়। এই কমলাও দূর্বোধ্য হয়ে উঠে। কেউ বলে এটা কমলা নয় মোসাম্বী, অন্যরা বলে মোসাম্বী বা কমলা নয়, এই ফল হচ্ছে মালটা। বিতর্ক বেড়ে চলে, এই ফলের গুণাবলী ব্যাপকভাবে আলোচনা হতে থাকে অর্থাৎ কমলা, সানতারা, মোসাম্বী, মালটা, বকোতারা, সুইটলাইম, টক লেবু, মিষ্টি লেবু ইত্যাদি। ডাক্তাররা এই সব ফলের ভিটামিন যাচাই করতে থাকে ও খাদ্যকে ক্যালোরীতে বিভক্ত করে। এক বছরে একজন ৭৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের কতখানি ক্যালোরী

দরকার তা নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা চলে এবং গান্ধীজীর এই কমলা ও মোসাম্বী যা কিছুই হোক না কেন পরিণামে সা'দত হাসান মান্টোতে রূপান্তরিত হয়। এটা আমার নাম কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের কিছু সংখ্যক লোকেরা নতুন সাহিত্য অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্যকে সা'দত হাসান মান্টো বলে আখ্যায়িত করেন। আর যাদের কড়া দষ্টিভঙ্গী পছন্দ করেন না তাদেরকে ইসমত চুঘতাই নামে অভিহিত করা হয়।

যেমন সা'দত হাসান মান্টো নিজের কালেই দুর্বোধ্য তেমনি সাহিত্য অর্থাৎ প্রগতিশীল সাহিত্যও আমার কাছে বোধগম্য নয়। এর আগেও আমি আরজ করেছি যারা আধুনিক সাহিত্যকে বুঝতে চেষ্টা করেন তাদের কাছেও তা বোধগম্য নয়। উদাহবণ স্বরূপ কয়েকটি নিবন্ধের জন্য এই আধুনিক সাহিত্যকে অশ্লীল ও মজদুরপন্থী সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি এই ধরনের আলোচনাকে খারাপ মনে করিনা। আমার যদি কোন নাম না থাকতো তা হলে সমালোচকদের কাছ থেকে হাজারো লাখো তিরস্কার উপহার পেতাম না। নামের পরিচয় থাকলে তিরস্কার ও প্রশংসা পেতে সুবিধা হয়। তবে যদি একই বস্তুর অনেক নাম হয় তা হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে বাধ্য। সবচেয়ে দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হয় প্রগতিশীল সাহিত্য সম্পর্কে অথচ এ নিয়ে কোন প্রকার বিতর্কের সৃষ্টি করা উচিত নয়। সাহিত্য হয় সাহিত্য নয়তো সাহিত্যই নয়। মানুষ হয়তো মানুষ নয়তো গর্দ্দভ, বাড়ীঘর, টেবিল, অথবা অন্য কোন বস্তু হতে পারে।

লোকে বলে সা'দত হাসান মান্টো একজন প্রগতিবাদী মানুষ। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সা'দত হাসান মান্টো মানুষ অতএব প্রত্যেক মানুষের প্রগতিশীল হওয়া উচিত। সমালোচকরা প্রগতিবাদী অপবাদ দিয়ে আমার গুণগান করেন না বরং নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকেন। এর মূল লক্ষ্য হল, তারা প্রগতিবাদী নয় অতএব তারা প্রগতি ও দেশের অগ্রগতিতে বিশ্বাসী নয়। আমি সমাজ জীবনের সকল স্তরে অগ্রগতি ও উন্নতি সাধনের পক্ষপাতি। আপনাদের সকলের উন্নতি হোক — এই আমার কাম্য। আজ আপনারা ছাত্র। উন্নতি করে আপনারাও স্বীয় আদর্শ ও লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন।

প্রত্যেক লোকই প্রগতি ও উন্নতির সমর্থক। লোকে যাদের উগ্রপন্থী বলে থাকে প্রকৃতপক্ষে তারাও নিজেকে প্রগতিবাদী বলে মনে করেন। আবার

প্রত্যেক যুগে মানুষ নিজেকে পূর্ববর্তী যুগের লোকদের চেয়ে অধিক মেধাবী, সভ্য ও প্রগতিবাদী বলে মনে করে এসেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। রাশেদ-আল্-খায়েরীর গল্প আধুনিক লোকদের কাছে নিরস মনে হয়। পাঠকদের অবস্থাও তথৈবচ। বাজারে যান পুস্তকের দোকানে আজ থেকে ২০ বছর আগেকার প্রবীণ লেখকদের বই কদাচিৎ নজরে পড়বে। এম, আসলাম, তীর্থরাম ফিরোজপুরী, সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ এবং আবেদ আলী আবেদের তুলনায় কৃষণচন্দর, রাজেন্দ্র সিং বেদী, ইসমত চুগতাই এবং সা'দত হাসান মান্টোর পুস্তক পাঠক মহলে অধিক জনপ্রিয়। কারণ কৃষণচন্দর ও তার সমসাময়িক নবীন লেখকরা জীবনকে নতুন বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করেছেন।

আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর পূর্বে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে দেশের পরিস্থিতি কেমন ছিল। যদি মোঘল শাসনের যুগ হত তবে সম্ভবতঃ আমার বাড়ীতেই একটা হেরেম থাকত। হেরেম না থাকলেও অন্ততঃ পক্ষে আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়ীতে দু তিনজন বাইজী অবশ্যই অবস্থান করত। কবিতা পাঠ ও কাব্য করার সখ থাকলে এখনই এই প্রবন্ধ লেখার পরিবর্তে অধ্যক্ষ সাহেবের প্রশস্তি গেয়ে কবিতা পাঠ করতাম। আনন্দে অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে অনেক কিছু উপহার দিতেন এবং যোগেশ্বরী কলেজ দান করে দিতেন, যেন একে নিজের পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু আপনারা জানেন, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমাকে এখান থেকে পায়ে হেঁটে ষ্টেশনে যেতে হবে এবং ফিলিমিস্তান কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে আমি ডাক্তারের কাছে এত দেরী করলাম কেন? আমি তাদের মিথ্যা বলে এসেছি, আমি ডাক্তারের কাছে টিকা দিতে যাচ্ছি। আমার আরজ এই যে, পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে এবং এই পরিবর্তনই সাহিত্যে বিচিত্র রঙ ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। বর্ত্তমান সাহিত্যের চিন্তা-ধারায় আমূল পরিবর্তন আপনার নজরে পড়বে। প্রাচীনকালে কবিরা মোরগ মুরগীর মৃত্যুতে দীর্ঘ শোক গাঁথা রচনা করতেন। সেকালে গল্পলেখকরা জীন-পরীর কাহিনী লিখে খ্যাতি লাভ করতেন এবং তাঁরা জীন-পরীদের চেয়ে কোন অংশে কম কৌতুকপ্রদ ছিলেন না।

তখনকার দিনে সাহিত্যিক ও লেখকরা ছিলেন চিন্তামুক্ত মানুষ, শান্তিতে কালাতিপাত করতেন। আর বর্ত্তমানে লেখকরা সমাজ, পরিবেশ, সাহিত্য

এমনকি নিজেদের প্রতিও আস্থাহীন এবং হতাশ হয়ে পড়েছে। লোকে তাদের এই মানসিক নিরাশা ও জীবন সম্পর্কে হতাশাকে ভুল ব্যাখ্যা করে বিকৃত নামে আখ্যায়িত করেছে।
কেউ আধুনিক লেখকদের প্রগতিবাদী, কেউ অশ্লীল লেখক, অনেকের মতে, এইসব তরুণ লেখকদের কল্পরাজ্যে শুধুমাত্র নারীই বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রথম মানব আদম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রত্যেক পুরুষের ঘাড়ে মেয়েরা চেপে বসে আছে। আর থাকবে না বা কেন? পুরুষের ঘাড়ে আর হাতী ঘোড়া সওয়ার হতে পারে না।

একটি কবুতর যদি কপোতীকে দেখে বাক বাকুম করে উঠতে পারে তবে নারীকে নিয়ে একজন পুরুষের গজল বা গল্প লিখতে আপত্তি কি? মেয়েরা কপোতীর চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়া ও লাবণ্যময়ী। আমি একটুও মিথ্যা বলছি না। বেশী দিনের কথা নয়, উর্দু কাব্যে মেয়েদের সুন্দর [illegible] রূপে চিত্রিত করা হত। কিন্তু আধুনিক কবিরা এই ধরনের চরিত্রের [illegible] বিরোধী। আধুনিক লেখকরা মেয়েদেরকে নারীর প্রকৃতরূপে দেখতে চায় এবং অন্যরাও এই মনোভাব পোষণ করুক এটাই তাদের কাম্য। খোদা না করুন, আপনি কি কখনও আপনার প্রিয়ার গালে দাড়ি গোঁফ সহ্য করতে পারবেন?

আমার বক্তব্য হচ্ছে, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের গতি প্রকৃতির ও ধারার পরিবর্তন হয়। বর্তমান যুগে সাহিত্যের ধারার যে বিবর্তন ঘটেছে তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা করা অথবা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বিষ ছড়ানো বৃথা। যারা আধুনিক সাহিত্যের প্রগতিবাদী গতিধারা, অশ্লীল সাহিত্য প্রভৃতিকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর তাদের একমাত্র সঠিক পথ হচ্ছে সাহিত্যের প্রগতিবাদী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করা। মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব, হায়দারাবাদের কবি মাহেরুল কাদেরী অথবা বোম্বের ঔষধ বিক্রেতা হাকিম মীর্জা হায়দার বেগের আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা বৃথা। যতদিন যাবত নারী পুরুষের আবেগ অনুভূতির মাঝখানে ধাঁধার প্রাচীর বিদ্যমান থাকবে ইসমত চুঘতাই-এর কলম স্তব্ধ হবে না। কাশ্মীরের মনোরম [illegible]পত্যকায় যতদিন শহরে পাপ বিরাজ করবে কৃষণচন্দরের লেখনী আপনাকে অশ্রুবরিষণে বাধ্য করবে। যতদিন মানুষের তথা সা'দত হাসান মান্টোর দুর্বলতা থাকবে ততদিন তারা সমাজের গোপন কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রকাশ করবেই। রাজা মাহমুদাবাদ ও তার সমর্থকদের বক্তব্য

হচ্ছে, আমাদের লেখনী বাজে এবং আমি যা কিছু লিখি তা নোংরামীতে পূর্ণ। আমি বলছি, তাদের অভিযোগ ষোলআনা সত্য কেননা আমি অশ্লীল ও যৌন বিষয় নিয়ে গল্প লিখি। রওজা মাহমুদাবাদ যদি কোন সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন অথবা হাকিম হায়দার বেগ যদি কোন কাশি প্রতিষেধক হাকিমী সরবত আবিষ্কার করেন ভাল কথা তবে তাদের সভাপতিত্ব বা কাশির টনিকের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। অবশ্য আমি ট্রেনে বসে বসে পকেট থেকে নতুন কেনা দামী কলমটা বের করি, উদ্দেশ্য লোকে আমার হাতের কলমটা দেখুক। আমার প্রতিবেশী কোন মহিলা যদি স্বামীর হাতে রোজ মার খেয়ে পরদিন সকালে আবার তাকে স্বামীর জুতা পরিষ্কার করতে দেখি তখন আমার মনে মহিলাটির জন্য সামান্যটুকু সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। কিন্তু যখন আমার প্রতিবেশী একজন মহিলা স্বামীর সাথে ঝগড়া করে আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে সিনেমায় চলে যায় এবং স্বামী দুঘন্টা যাবত দারুণ উদ্বেগের মাঝে কাটান, তখন আমার স্বামী স্ত্রী দু'জনের জন্যই বিচিত্র ধরণের সহানুভূতির উদ্রেক হয়। কোন তরুণ যদি একজন তরুণীর প্রেমে পড়ে তখন একে আমি সর্দি কাশির সমতুল্য গুরুত্ব দেই না। কিন্তু যে যুবক প্রমাণ করতে পারবে যে, বহু মেয়ে তার জন্য আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

আসলে সে ভালবাসার কাঙাল বাংলার দুর্ভিক্ষ এলাকার ক্ষুধার্ত মানুষের ন্যায়। উক্ত যুবক প্রেমিকের রঙীন স্বপ্নেভরা মিষ্টি আলাপ ট্রাজেডীতে পরিপূর্ণ। তার কথোপকথনকে আমি মনের মাধুরী দিয়ে শোনার চেষ্টা করবো এবং অন্যদের শোনাব। সারাদিন যে মহিলা চাক্কা পিষে আর রাতে অঘোরে ঘুমায় সে আমার গল্পের নায়িকা হতে পারবে না।

পতিতালয়ের দেহ পসারিনী তরুণী আমার গল্পের নায়িকা হবার যোগ্য; সারারাত জেগে খদ্দেরদের যৌন কামনা পূরণ করা আর সারাদিন ঘুমিয়ে থাকাই যার কাজ। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে বিছানায় যে উঠে বসে আর ভাবে হয়তো কোন খদ্দের এসে দরজায় করাঘাত করছে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু পতিতা যার চোখের পাতায় হাজার হাজার বছরের নিদ্রা পুঞ্জিভূত সেই-ই আমার গল্পের এক মাত্র মনঃ বিষয়বস্তু। এই পতিতার নোংরামি, রোগ, চাঞ্চল্য আর গালি সবই আমার প্রিয়। আমি এই পতিতাদের নিয়ে লিখে আনন্দ পাই আর সংসারী মেয়েদের মার্জিত আলাপ তাদের উদ্ভিন্ন যৌবন আর পরিচ্ছন্নতাকে আমি অবজ্ঞা করি।

অভিযোগ করা হয়েছে, তরুণ লেখকরা নরনারীর যৌন সম্পর্কে নিজেদের রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন। আমি সকলের পক্ষ থেকে জবাব দিতে চাই না ; নিজের সম্পর্কে বলছি, এই বিষয়বস্তু আমার প্রিয়। কিন্তু কেন? ধরে নিন, আমার বিকৃতি ঘটেছে। আপনি বুদ্ধিমান আর সব কিছুর পরিণাম কি হবে পরখ করতে পারবেন তবে বুঝে নিতে পারবেন আমার এই রোগ উৎপত্তির কারণ কি? বর্তমান যুগ প্রবাহ সম্পর্কে আপনি সচেতন হন তাহলে আমার গল্প পড়ুন। আমার গল্প যদি সহ্য করতে না পারেন তাহলে আমি মনে করব আপনি বর্তমান যুগটাকেও বরদাশত করতে পারছেন না। আমার মাঝে যে দোষ ত্রুটি রয়েছে তজ্জন্য বর্তমান কালই দায়ী। আমার লেখনী দোষত্রুটিমুক্ত। আমার নামে যে দুর্নাম রটানো হচ্ছে আসলে তা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থারই ভুল! আমি উগ্রপন্থী নই। আমি মানুষের চিন্তায় ও আবেগ অনুভূতির মাঝে দারুণ ভাবাবেগপূর্ণ গতির সৃষ্টি করতে চাই না। বর্তমান সমাজের তাহজীব, তমদ্দুন সব কিছুই নগ্ন, তাকে আবার পোষাক খুলে উলঙ্গ করার কি প্রয়োজন? আমি এই তাহজীব ও তমদ্দুনকে পোষাক পরানোর চেষ্টা করি না ; কেননা এই দায়িত্ব দর্জির, আমার নয়। লোকে আমাকে ''কৃষ্ণ লেখক'' নামে আখ্যায়িত করেছে। আসলে আমি কালো স্লেটের বুকে কালো কালি দিয়ে লিখিনা বরং কালো স্লেটে সাদা কালির সাহায্যে লিখি যেন অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এইই আমার লেখনীর বিশেষ ষ্টাইল। একে অশ্লীল প্রগতিবাদী এবং খোদা জানেন, নানা নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। হাজার ধিক সা'দত হাসান মান্টোর প্রতি ''কম বখ্‌ত কে'' কেউ ভদ্রভাবে গালিগালাজ করে না।

বাড়ীতে যখন আমি লিখি সকলে আমার উপর ক্ষুব্ধ। বাইরের লোকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠেছে। বাড়ীর গিন্নির অনুযোগ, 'কোথাও একটা চাকরীর চেষ্টা কর। কতদিন মিছামিছি গল্প লিখে সময় নষ্ট করবে।' আট দশ বছর পূর্বে গল্প লেখা বেকারদের একমাত্র কাজ বলে গণ্য করা হত আর ইদানিং একে আধুনিক সাহিত্য নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে মানুষের চিন্তাধারার অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। সেদিন বেশী দূরে নয় যখন লোকেরা আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা খুঁজে পাবে এবং হাকিম হায়দার বেগ দেহলভীকে ডাক্তারখানা ছেড়ে নবীন লেখকদের রোগের প্রেসক্রিপসন লেখার জন্য কষ্ট করতে হবে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর পর থেকে আধুনিক সাহিত্যের উপর নতুন উদ্দীপনার সাথে হামলা চালানো হয়েছে। লোকে বলে, একদিকে সমগ্র বিশ্বে মহাযুদ্ধের ধ্বংস লীলা চলেছে, দৈনিক হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে অন্য দিকে যৌন ব্যবসা ও দেহের বেসাতীর বাজার সরগরম রয়েছে। এমতাবস্থায় আধুনিক লেখকরা কি করে নীরবে চুপচাপ বসে থাকবে? তাদের লেখনী কি শুধু মাত্র যৌন অশ্লীলতার সাগরে নিমজ্জিত? পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে এক-একটি নতুন সাইক্লোনের সংকেত বেজে উঠছে। কিন্তু তাদের চিন্তা-ভাবনায় ও মনে ময়লা জমে আছে যা সহজে মুছে ফেলা দুস্কর।

আমি অন্যদের পক্ষে উত্তর দিতে চাই না। নিজের ব্যাপারে এইটুক বলতে পারি যে, পৃথিবীর চেহারা সত্যিই পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছু লিখলেই আমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। আমি ভীতু লোক, জেলকে ভয় করি। এই জীবনটা যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছি কারাগারের চেয়ে কোন অংশে কম বেদানাদায়ক নয়। কিন্তু এই কারাগার তুল্য জীবনের অভ্যন্তরে যদি অপর একটি জেল তৈরী করে আমাকে নিক্ষিপ্ত করা হয় তাহলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হবে। জীবনকে আমি ভালবাসি তৎসঙ্গে প্রাণচাঞ্চল্যকেও। প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে আমি বুক পেতে গুলি খেতে রাজী কিন্তু জেলে চোরপোকার ন্যায় মরতে চাইনা। এখানে সাহিত্যের অঙ্গনে লেখনীর জন্য আপনাদের সকলের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে টুশব্দ পর্যন্ত করব না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কেউ যদি আমাকে মাথা ফাটিয়ে দেয় তা হলে আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু আর্তনাদ করে উঠবে, "আমি একজন শিল্পী, খুন জখম আর হানাহানি আমি পছন্দ করি না।"

যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কিছু লেখার পর একটি অন্ধকার কুঠরীতে পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা—এই ধরণের মৃত্যুবরণের চেয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ডেইরী ফার্ম খুলে, পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করাই শ্রেয়। আমি যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই লিখছি না। গোলা ও টর্পেডোর কথা বাদ দিন আমি কোনদিন বন্দুক পর্যন্ত চালাই নি। কৈশোরের কথা মনে পড়ছে। আমার প্রতিবেশী একজন দারোগা ছিলেন। তাঁর কোমরে পিস্তল ছিল। বাড়ীতে পিস্তল খুলে খাটে রাখার পর সব ছেলেদের সাবধান করা হত, "এই কামরায় পিস্তল আছে। কেউ যেও না কিন্তু।"

অনেক সময় আমি ভীতকম্পিত পদে সেই কামরায় গিয়ে যখন এই মারাত্মক অস্ত্রের দিকে তাকাতাম, তখন আমার বুক দুরু দুরু করত। মনে হত যেন এই খাটে রাখা পিস্তল থেকে আপনা আপনি গুলি বেরিয়ে পড়বে। এবার বলুন, আমি ও আমার বন্ধুরা ট্যাঙ্ক সম্পর্কে কি লিখব। মিহিন জামা-কাপড়ের প্রতি আমার কোন লোভ নেই। আমার ইস্ত্রি করা সামরিক পোষাক পরার সখ নেই বা পিতলের ও তামার তমঘা ও কাপড়ের রঙীন ব্যাজের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। হোটেলে বল নৃত্যে শরীক হয়ে, ক্লাবে মদ্যপান করে এবং ট্যাক্সিতে দেহপসারিণীর সাথে ঘুরে বেড়িয়ে আমি সৈনিকদের খাতায় নাম লেখাতে চাই না। এর চেয়ে কৌতুকপ্রদ ছবি আমার রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ এই ছবি মন্দ নয়, আমি রোজ বোম্বে সেন্ট্রাল থেকে পতিতালয় আর পতিতালয় থেকে বোম্বে শহরে ট্রেনে যাতায়াতকারী বহু খাকি পোষাকধারী সৈন্যের আনাগোনা দেখতে থাকি। অধিকাংশ সৈন্য বিজয়কে আসন্ন করার উদ্দেশ্যে মদ্য পান করে অর্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় ট্রেনে পড়ে থাকে, নতুবা এদেরকে অতীব কুশ্রী মেয়েদের সাথে আমার সামনে বসা রোমান্সে মত্ত থাকতে দেখেছি।

আমি এই যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই লিখছি না। কিন্তু যখন আমার হাতে পিস্তল থাকবে আর সেখান থেকে অটোমেটিক গুলী বেরিয়ে পড়ার ভয় থাকবে না তখন আমি হাতে পিস্তল দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে পড়ব আর আমার প্রকৃত শত্রুকে খুঁজে বের করে পিস্তলের সবকটি গুলি তার বুক বিদীর্ণ করে ফায়ার করব অথবা নিজের বুকেই বিদ্ধ করব। এই মৃত্যু সংবাদে আমার কোন সমালোচক যদি বলেন, 'বেটা পাগল ছিল' তাহলে আমার আত্মা এই বাক্যকে সবচেয়ে মূল্যবান 'তকমা' মনে করে তুলে নিয়ে বুকে স্থান দেব।

ঠাণ্ডা গোস্তের মামলা

বোম্বাই ছেড়ে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে করাচী হয়ে লাহোর এসেছি। তিন মাস যাবত দারুণ টানা-পোড়নের মধ্যে কাটাই। বুঝতে পারতামনা, কোথায় বসে আছি, করাচীতে আমার বন্ধু হাসান আব্বাসের বাড়ীতে, বোম্বেতে না লাহোরে। লাহোরে কয়েকটি হোটেলে কায়েদে-আজম কাণ্ডের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নৃত্য গীতের আসর লেগেই আছে।

তিন মাস যাবত আমার চিন্তা বা কল্পনা রাজ্যে কোন স্থিতিশীলতা আসেনি। কখনও করাচীর দ্রুতগামী ট্রাম, গাধার গাড়ী, আবার বোম্বের বাজার ও অলিগলি, অনেক সময় লাহোরের জম-জমাট হোটেলের দৃশ্য আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। সারাদিন চেয়ারে বসে কল্পনা রাজ্যে হারিয়ে যেতাম। অবশেষে বোম্বে থেকে যা টাকা সঙ্গে এনেছিলাম, বাড়ীতে ও বাড়ীর অদূরে "ক্লিফটন পান্থসালায়" নিঃশেষ হয়ে গেছে। এবার আমার টনক নড়ে। এবার আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম, আমি লাহোরের উপকণ্ঠে অবস্থান করছি। ভাবতে থাকি কিছু একটা করতে হয়। খবর নিয়ে জানতে পারি, দেশ বিভাগের পর ফিল্ম কোম্পানীগুলির নিভু নিভু অবস্থা। চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কারবার কোম্পানীর অফিসেব সম্মুখস্থ সাইন বোর্ডেই সীমাবদ্ধ। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। জমি বরাদ্দের তোড়জোড় চলছে। মোহাজির ও অমোহাজিররা ধরপাকড় করে কারখানা ও দোকান পাটের জন্য এলটমেণ্ট নিচেছ! আমাকে জমি নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু এই লুটপাটে অংশ গ্রহণে আমার মন সায় দেয়নি।

তখন জানতে পারি বিশিষ্ট কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও চেরাগ হাসান হাসরাত দু'জনে মিলে একটি উর্দু দৈনিক প্রকাশের চেষ্টা করছেন। উক্ত দৈনিকের নাম "ইমরোজ"। আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন

পত্রিকার জানি তৈরী হচ্ছে। দ্বিতীয় বার যখন দেখা করি, উক্ত দৈনিকের কয়েক সংখ্যা বের হয়ে গেছে। পত্রিকার গেটআপ দেখে আনন্দিত হয়েছি। ইচ্ছে হয়েছে লেখনী শুরু করব কিন্তু লিখতে বসে দেখি কল্পনা রাজ্য ফাঁকা। অনেক চেষ্টা করেও পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারিনি। পাকিস্তানে উর্দু ভাষার রীতি কেমন হবে। আমাদের রাষ্ট্র কি ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে? বার বার প্রশ্ন জেগেছে পাকিস্তানের সাহিত্য কি ধরনের হবে। রাষ্ট্রের প্রতি আমরা সর্বদা অনুগত থাকব সত্য কিন্তু আমরা কি সরকারী নীতির সমালোচনার অধিকার পাব? নানা জিজ্ঞাসা আমার মনে ভীড় জমায় কিন্তু এগুলির কোন সমাধান পাইনি। যেদিকে তাকাই শুধু ভীতি আর শঙ্কা। কিছু লোক আনন্দে আত্মহারা। কারণ তাদের হাতে আকস্মিকভাবে প্রচুর ধন সম্পদ এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। অধিকাংশ মোহাজির বিষন্ন ও চিন্তাগ্রস্থ কারণ তারা লুন্ঠিত; সর্বস্ব ত্যাগ করে এদেশে চলে এসেছে।

বেতারে ইকবালের গজল রাতদিন প্রচার করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফিচার প্রোগ্রামে হাঁস মুরগী পালন, জুতা তৈরী, চামড়া রঙ করার নিয়ম এবং মোহাজির ক্যাম্পে কতলোক এসেছে আর গেছে ইত্যাদি প্রচারিত হয়ে থাকে।

আমি বন্ধুবর আহামদ নাদিম কাসমীর সাথে দেখা করি। কবি সাহির লুধিয়ানভীর সাথে দেখা হয়। আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকলেই মানসিকভাবে উদ্বেগ ও শঙ্কার মাঝে কালাতিপাত করছেন। আমার মনে হয়েছে, এক বিরাট ভূমিকম্পের ধাক্কায় বিস্ফোরনোন্মুখ অগ্নিগিরির জ্বালামুখে কিছু লাভা আটকা পড়ে আছে। এগুলি বেরিয়ে পড়লে গোধূলির ন্যায় আকাশ পরিষ্কার হবে। তখন বলা যাবে, প্রকৃত পরিস্থিতি কি?

এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। বেকার সারাদিন ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়াই নিজে চুপ চাপ অন্যদের নিরস রাজনৈতিক আলোচনা, বিতর্ক শুনি। ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়ানোর ফলে আমার উপকার হয়েছে। চিন্তারাজ্যে যে সব আজে বাজে ভাবনা ভিড় জমিয়েছিল সব ক্রমশ দূরীভূত হয়। অতঃপর আমি চটুল রচনা লেখায় হাত দিই। 'ইমরোজের' জন্য "নাকের প্রকার ভেদ" ও "দেওয়ালের লিখন" শীর্ষক দু'টি রম্য নিবন্ধ লিখি। পাঠকদের কাছে আমার দুটো লেখাই পছন্দ হয়। এরপর আমি নিয়মিত ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখতে শুরু করি। এই রচনা পরে "তলখ তরস আওর শিঁরিন" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

গল্প লিখতে মন চায় না। গল্প লেখা আমি দুরূহ কাজ বলে মনে করতাম। এই জন্য গল্প লেখা এড়িয়ে চলতাম। তখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আহামদ নাদিম কাসমী বেতারে তাল-বেতাল জিনিস লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে পেশোয়ার রেডিও থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে লাহোর এসে "নাকুশ" নামক একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করেন। তার শত আবদার সত্ত্বেও 'নাকুশের' জন্য আমার গল্প লেখার ফুরসত পাইনি। তিনি আমার উপর রাগ করেন। অবশেষে আমি "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প লিখি। এটাই আমার পাকিস্তানে প্রথম রচিত গল্প এবং সেটাই আমার বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কাসমী সাহেব আমার সামনে গল্পটি পড়েন কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারিনি। গল্প পড়া শেষ করে তিনি শান্ত কণ্ঠে জানান, "মান্টো সাহেব মাফ করবেন, আপনার ঠাণ্ডা গোস্ত গল্প খুব ভাল হয়েছে। কিন্তু 'নাকুশের' জন্য অত্যন্ত মারাত্মক।" আমি নীরবে কাসমী সাহেবের কাছ থেকে গল্পটি ফেরত নিয়ে নিই এবং তাঁকে পরদিন সন্ধ্যায় আসতে বলি। পরদিন তাঁকে দ্বিতীয় গল্প লিখে দেয়ার অঙ্গীকার করি।

পরদিন সন্ধ্যায় কাসমী সাহেব এসে হাজির। তখন আমি "খুল দো" গল্প লিখছিলাম। এই গল্পের শেষ কয়েকটি লাইন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমার গল্প লেখা শেষ করতে বেশ সময় লাগে। কাসমী সাহেব এতক্ষণ আমার গল্প শেষ করার অপেক্ষায় ছিলেন। "খুলে দাও" গল্প লেখা শেষ হলে পাণ্ডুলিপি আহামদ নাদিম কাসমীর হাতে দিই।

এই গল্প তার মনঃপুত হয়েছে। তাই "খুলে দাও" গল্পটি কাসমী সাহেব নিয়ে যান এবং উর্দু সাময়িকী "নাকুশে" প্রকাশ করেন। গল্পটি পাঠক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করে কিন্তু সরকার এই জনপ্রিয়তাকে জননিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর মনে করেন। সরকার "নাকুশ" সাময়িকী ছয় মাসের জন্য প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন। পত্র পত্রিকায় এর দারুণ বিরূপ সমালোচনা হয় কিন্তু সরকারী বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয়নি।

দীর্ঘদিন কেটে গেছে। মাসিক "আদব ও লতিফ" এর সহকারী সম্পাদক এসে আমার "ঠাণ্ডা-গোস্ত" গল্প নিয়ে যান। গল্প ছাপা হচ্ছে। কপির প্রুফ দেখা হচ্ছে। সাময়িকীর ফাইনাল প্রিন্টের সময় জনৈক কর্ম কর্তার নজর "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পের উপর পড়ে। তিনি ঠাণ্ডা গোস্ত গল্প সাময়িকীতে প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান এবং এই গল্পবাদ

সাময়িকী প্রকাশিত হয়। চৌধুরী বরকত আলী কোয়েটা থেকে লাহোর ফিরে এসে মাসিক "আদবে লতিফে" এর পরবর্তী সংখ্যায় "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প প্রকাশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গল্পের পাণ্ডুলিপি আমাকে ফেরত দেয়া হয়।

ইতিপূর্বে করাচী থেকে মোহতরমা মমতাজ সিরীনের কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে তার নিজস্ব সাহিত্য সাময়িকী "নয়া দস্তর" এর জন্য গল্প পাঠানোর তাগাদা দিয়েছেন। আমি "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পটি করাচী পাঠিয়ে দিলাম। দীর্ঘদিন পর উত্তর এল, তারা "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পটি প্রকাশ করতে পারবেন কিনা বিবেচনা করে দেখছেন। গল্পটি খুবই ভাল। কিন্তু ভয় হয় পাছে সরকারী রোষানলে না পড়ে। "ঠাণ্ডা গোস্ত" করাচী থেকেও ঠাণ্ডা হয়ে আমার কাছে পুনরায় ফেরত আসে। এবার ভাবলাম এই গল্প আর কোন সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৬ মাস পূর্তির পূর্বেই সরকার "নাকুশের" উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করেন। আমি লাহোরের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান "নয়া ইদারার" জন্য 'নমরুদ কি খোদাই' নামক একটি গ্রন্থ সংকলন প্রণয়ন করি। এতে "খুলে দাও" গল্পের সাথে "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পও সংযোজিত করি। ইতিমধ্যে বন্ধুবর আরেফ আবদুল মতিন "জাবিদ" পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি আমার লেখা "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প প্রকাশের জন্য জেদ ধরেন। আমি অবশেষে "নয়া ইদারার" মালিক চৌধুরী নাজির আহামদকে একটি চিরকুটে "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পের পাণ্ডুলিপি আরেফ সাহেবকে দিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। আরেফ সাহেব ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সাহিত্য সাময়িকী "জাবিদ" এর বিশেষ সংখ্যায় 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্প প্রকাশ করেন। পত্রিকা সর্বত্র বিলি শেষ হয়েছে। একমাস কেটে গেছে। আমি মনে করলাম, বিপদ কেটে গেছে। সরকারী প্রেস ব্রাঞ্চের প্রধান বৃদ্ধ চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব হঠাৎ তৎপর হয়ে ওঠেন। আমি উড়ো খবর শুনেছি, পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে "জাবিদ" এর বিশেষ সংখ্যাগুলি বাজেয়াফত করে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে "জাবিদ" সাময়িকীর মালিক জনাব নাসির আনোয়ারের চিঠি পেলাম; তিনি লিখেছেন, পুলিশ এসে "জাবিদ" এর সব কপি বাজেয়াফত করেছে এবং সার্কুলেশনের খাতাপত্র দেখে সকল এজেন্টদের ঠিকানা টুকে নিয়েছে। আগামীতে সাময়িকী সরবরাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এটা বিপদের লক্ষণ। অভিযুক্তদের সত্ত্বর হাজতে পাঠাবে বলে অনুমান হয়। ইতিপূর্বে অশ্লীলতার

অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে তিনবার মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং প্রতি-বারেই বেকসুর খালাস পেয়েছি। এবার হয়তো আর রেহাই পাবনা।

ঘটনাটি প্রেস উপদেষ্টা বোর্ডে পেশ করা হয়। পাকিস্তান টাইমসের তদানীন্তন সম্পাদক জনাব ফয়েজ আহামদ ফয়েজ হলেন এই বোর্ডের সভাপতি। "জাবিদ" সাময়িকীর মালিক জনাব আনোয়ারও এই বোর্ডের অন্যতম সদস্য। তিনি জানান যে, "পাকিস্তান টাইমস অফিসে প্রেস উপদেষ্টা বোর্ডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসনে ছিলেন জনাব ফয়েজ আহামদ ফয়েজ। সভায় সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারী গেজেটের এফ ডব্লিউ বোষ্টন, দৈনিক জমিন্দারের মওলানা আখতার আলী, সাজিদ নিজামী (নওয়ায়ে-ওয়াক্ত) ওয়াকার আম্বালাভী উপস্থিত ছিলেন। চৌধুরী মোহাম্মদ হোসেন বৈঠকে "জাবিদ" এর বিশেষ সংখ্যা পেশ করেন। জনাব ফয়েজ আহামদ ফয়েজ বারবার সরকারী অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প অশ্লীল নয় বলে যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু মওলানা আখতার আলী গর্জন করে ওঠেন, পাকিস্তানে এই ধরনের সাহিত্য চলতে পারে না। জনাব সাহরাইও তার প্রতি সমর্থন জানান। ওয়াকার আম্বালভীও গল্পটির সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। হামিদ নিজামীও পরিস্থিতির সাথে তাল রেখে সায় দেন। ফয়েজ আহামদ সাহেব অনেক আশ্বাস দান সত্ত্বেও চৌধুরী সাহেব নিজের সংকল্পে অটুট থাকেন। অবশেষে আদালতেই এর ফায়সালা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

কয়েকদিন পর নাসির আনোয়ার, আরেফ আবদুল মতিন ও আমাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ ইন্সপেক্টার খোদা বখ্স অত্যন্ত নম্র মেজাজের লোক। কয়েকদিন আমার বাড়ীতে ঘোরাঘুরি করার পর একদিন আমার দেখা পায়। তিনি আমাকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরদিন থানায় গিয়ে জামিন নিয়ে আসার অনুরোধ জানান। পরদিন আমার বন্ধু শেখ সেলিম জামিন নামায় সই করে থানা থেকে আমার জামিন নিয়ে নেন। আরেফ আবদুল মতিনের আদালতের নাম শুনতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে যেত। কারণ সে একজন কমুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য হয়। আমরা তিনজন কোর্টে গিয়ে হাজির হলাম। আমার জন্য কোর্টকাচারী নতুন নয়। ইতিপূর্বে তিনটি মামলা লড়েছি এবং বহুবার আদালতে হাজিরা দিয়েছি। এর নাম জেলা কাচারী কিন্তু বড্ড বিশ্রী স্থান। মুখে এর বর্ণনা দেয়া অসম্ভব। কারণ

এখানকার আবহাওয়া, পরিবেশ, ভাষা, রীতিনীতি সম্পূর্ণ বিচিত্র ধরনের। আল্লাহ্ যেন সবাইকে এর থেকে দূরে রাখেন।

উকিলের জেরা শুরু হবে। আদালতে হাজির হবার সময় জনাব তাসাদ্দুক হোসেন খালেদের সাথে দেখা হয়। তিনি আমার মামলা পরিচালনার ভার নেন। আমাদের তিনজনকে অভিযুক্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিয়া এ, এম, স'ঈদের আদালতে পেশ করা হয়। মিয়া সাঈদ সাহেব ইতিপূর্বে সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। এখন বন্দুক ছেড়ে বিচারকের মানদণ্ড হাতে নিয়েছেন। জুন মাসের প্রচণ্ড গরম। তাসাদ্দক হোসেন খালেদ আমাদের পুনরায় জামিন নিয়ে নেন এবং শুনানীর পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়। তাসাদ্দুক সাহেব আমাকে মামলা অন্যত্র স্থানান্তরের সুপারিশ করেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। বাদী পক্ষে কাপুর আর্ট প্রেসের ম্যানেজার মোহাম্মদ ইয়াকুব, লাহোর ডিসি অফিসের এ্যাসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শেখ মোহাম্মদ তোফায়েল, পাঞ্জাব সরকারের প্রেস ব্রাঞ্চের মুখপাত্র সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আহামদ এবং আরও কয়েক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করা হয়।

সৈয়দ জিয়াউদ্দীন আহামদ বলেন, তার মতে "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। বাদী পক্ষের সাক্ষ্যদান শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে আমার পক্ষ থেকে কৌসুলী খালেদ সাহেব জানান যে, "ঠাণ্ডা গোস্ত" অশ্লীল গল্প নয় বরং এটা একটি শিক্ষামূলক গল্প। এই গল্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কারণ কি জিজ্ঞাসা করা হলে আমি উত্তর দিই, "একমাত্র পুলিশই ভাল বলতে পারেন।"

এবার আমাদের কৌসুলী খালেদ সাহেব বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের তালিকা পেশ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সাক্ষীদের দীর্ঘ তালিকা দেখে ক্ষেপে ওঠেন। অবশেষে অতিকষ্টে আমাদের ১৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণে সম্মত হন। সাক্ষীদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারী করা হয়। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, সাক্ষীরা আমার গল্পের ব্যাপারে নিজেদের মতামত বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করুক। এর ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারব। সাক্ষী বেচারীরা ভোরে কাজকর্ম ছেড়ে আদালতের কাঠগড়ায় ঘণ্টারপর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত। এই জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আমরাত আসামী। কিন্তু সাক্ষীদের অবস্থা আমাদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ছিল না। আমরা

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতাম আর বেচারী সাক্ষীরা আদালতের বাইরে অপেক্ষা করত।

আমার বন্ধু শেখ সেলিমের অবস্থা দেখে করুণা হত। সকাল সন্ধ্যা সে মদ্যপানে অভ্যস্থ। কাচারীতে আসার সময় ছোট্ট বোতলে হুইস্কি ভর্তি করে নিয়ে আসত আর কিছুক্ষণ পর পর তা গলাধঃকরণ করত। সাহিত্যের সাথে তার কোন সরাসরি যোগাযোগ নেই। তবে লোকের সাথে কথাবলার সময় বলতেন, "এতে অশ্লীলতার কিইবা আছে। মন্টোর "ঠাণ্ডাগোস্ত" গল্প আমি পাড়িনি কিন্তু সেটা অশ্লীল হতে পারে না। কারণ মান্টো একজন শিল্পী।"

আমাদের প্রথম সাক্ষী দয়ালসিং কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবেদ আলী আবেদ। তিনি বলেন, প্রেমচন্দ্রের পর মাণ্টোর উর্দু ছোট গল্প সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। "ঠাণ্ডাগোস্ত" গল্পে ঈশ্বর সিং তার অপকর্মের শাস্তি নিজে-নিজেই পেয়েছে। তার মতে সাহিত্য কখনও অশ্লীল হতে পারে না। তাছাড়া তার বড় মেয়ে কলেজের ছাত্রী এই গল্পটি করেকবার পড়েছে। বাড়ীর সকলেই গল্পটি পড়েছে। অনেকের সাথে তার এই গল্পের ব্যাপারে মতবিনিময় হয়েছে সকলে 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিবাদীপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী দয়ালসিং কলেজের অধ্যাপক জনাব আহামদ সাঈদ বলেন যে, "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প অশ্লীল হতে পারে না। তবে এতে এক বিরাট যৌন সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে। মানসিক দিক থেকে বিকার গ্রস্ত লোকেরা "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প পাঠে বিপথগামী হতে বাধ্য।

মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন আমাদের কৌসুলী মিয়া তাসাদ্দুক হোসেন খালেদ অনুপস্থিত। তার বাড়ীতে কে জানি অসুস্থ। আমাদের মামলা শুনানীর জন্য তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। সেবারও খালেদ সাহেব আদালতে হাজির হননি। কারণ তার ছেলে নাকি সেদিন বিলেত থেকে দেশে ফিরেছেন তাই তাকে সম্বর্ধনার জন্য তিনি করাচী চলে গেছেন। আমি দারুণ ফাপরে পড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট আর তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজী হলেন না এবং মামলার শুনানী শুরুর নির্দেশ দিলেন। আমি ছটফট করতে থাকি। এদিকে বাদীপক্ষের উকিল আদালতে হাজির হয়েছে। অবশেষে আমিই সাক্ষীদের জেরা শুরু করি। আমার বড় দুইভাই ব্যারিষ্টার। আমার

রক্তে উকিলের শোনিতধারা প্রবাহিত। আমাকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতী কায়দা কানুন সম্বন্ধে সজাগ করে দেন। কিন্তু আমি মোটেই ঘাবড়াইনি বরং দৃঢ়তার সাথে ৪ নম্বর সাক্ষী ডঃ সাঈদ উল্লাহকে জেরা করতে থাকি। ইত্যবসরে আদালতকক্ষে ৪ জন তরুণ উকিল এসে প্রবেশ করে। সকলের পরনে কাল গাউন। একজন পাতলা গোঁফধারী সুদর্শন তরুণ আমার পাশেএসে দাঁড়ায়। মাঝখানে আমাকে কানে কানে বলে, "মাণ্টো সাহেব আমরা কি আপনাকে মামলায় সাহায্য করতে পারি।" আমি কোন কিছু না ভেবে সম্মতি জানাই। এই তরুণ উকিল সাক্ষীদের জেরা শুরু করেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জানতে চাইলে তিনি জানান, "হুজুর আমি মাণ্টো সাহেবের উকিল।" আমিও মাথা নেড়ে সায় দিই। মামলার শুনানী শুরু হয়। উক্ত তরুণ উকিলের তিন বন্ধুও জেরায় অংশ গ্রহণ করে। তাদের জেরায় ও কথাবলার ভঙ্গীতে তারুণ্যের ছাপ বিদ্যমান; যেন কলেজের উচ্ছল যৌবনময় ছাত্র। ম্যাজিস্ট্রেট আবার তাদের প্রশ্ন করে, "আপনারা কেন মাঝখানে কথা বলছেন?" তারা জবাব দেয়, "আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের উকিল তাইনা মান্টো সাহেব।" আমি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে "হাঁ" বলি।

ডাক্তার সাঈদউল্লাহ সাহেব সাক্ষ্যদান কালে বলেন যে, আমি 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্প পাঠের পর নিজেই ঠাণ্ডা গোস্ত বনে গেছি। তবে লেখক গল্পে বড় দক্ষতার সাথে গালগুলো উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর লেখনীর ষ্টাইল শিল্পীর স্বাক্ষর বহন করে। আমি তাই "ঠাণ্ডা গোস্তের" লেখককে জীবনের প্রতিচছবির দক্ষ শিল্পী বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করব না।

এরপর পাকিস্তান টাইমসের সম্পাদক ফয়েজ আহামদ ফয়েজের পালা। আদালতে জবানবন্দী দেওয়ার সময় জনাব ফয়েজ আহামদ ফয়েজ বলেন যে, "আমার মতে এই গল্প অশ্লীল নয়। একটি গল্পে কয়েকটি শব্দকে অশ্লীল অথবা অশ্লীল নয় বলে রায় দেয়া অযৌক্তিক। গল্প পর্যালোচনা করার সময় আংশিক নয় বরং গোটা গল্পটিকে পরখ করে দেখতে হবে। আমার মতে, লেখক এই গল্পে অশ্লীল কিছুই লেখেননি তৎসঙ্গে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিও পূরণ করেননি। কারণ এই গল্পে জীবনের মৌলিক' সমস্যাবলীর সন্তোষজনক সমাধান নেই।" জেরার জবাবে ফয়েজ আহামদ ফয়েজ বলেন যে গল্পের বিষয়বস্তু দেখে আমি এমন সব শব্দ ব্যবহার যুক্তি

সঙ্গত মনে করি। যদিও এই সকল শব্দ পার্লামেন্টারী নয় তবে সাহিত্যে তা ব্যবহার করা যায়।

ফয়েজ আহামদ ফয়েজের পর সাক্ষ্যদান করেন সুফী গোলাম মোস্তফা তবস্‌সুস, অধ্যাপক সরকারী কলেজ, লাহোর।

সুফী তবস্‌সুম সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প মানুষের চরিত্র খারাপ করতে পারে না। এই গল্পের দু'একটা শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে অশ্লীল হতে পারে। কিন্তু মানুষের যৌনবোধকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করায় আমাদের সাহিত্যের ধারা সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এরপর আমি ৪ জন তরুণ উকিলের পরিচয় দিতে চাই। এদের মধ্যে পাতলা গোঁফধারী শ্যামলা তরুণ উকিলের নাম শেখ খুরশীদ আহমদ। অপর তিনজন হলেন জনাব মজহারুল হক, সরদার মুহাম্মদ ইকবাল এবং জনাব ইজাজ মোহাম্মদ খান। এরা আদালত থেকে বের হয়ে জানতে পারেন যে, আমি নিজের মামলা নিজেই পরিচালনা করছি তখন তাড়াতাড়ি আমার সাহায্যের জন্য আদালতে এসে হাজির হন। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করায় শেখ খুরশীদ আহামদ বললেন, "এর কিই বা প্রয়োজন। বরং মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমি "ঠাণ্ডা গোস্ত" মোটেই পড়িনি।" আমাদের সাতজন সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু অপর সাতজন সাক্ষীকে আদালতে হাজিরের দাবী জানালে ম্যাজিস্ট্রেট তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ এতে আমাদের পাল্লা ভারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এরপর আদালতে মওলানা তাজোর নজিবাবাদী, সোরেশ কাশ্মিরী, আবু সাঈদ বজ্‌মী ও ডক্টর মুহাম্মদ দীন তাসিব এর ডাক পড়ে। মওলানা তাজোরের মতে, এ ধরনের অশ্লীল গল্প সে জীবনেও পড়েনি।

আগা সোরেশ কাশ্মিরী আমার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে করমর্দন করেন। তারপর সাক্ষ্যদানকালে আমার দিকে আড় নজরে একবার দেখে বলেন যে, "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প থেকে আমি ভাল ধারণা নিতে পারিনি। কারণ আমরা যে সমাজ ও পরিবারে লালিত পালিত সেখানে এই ধরনের গল্প আমার পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব না। কারণ আমার চিন্তাধারা তা সহ্য করতে সক্ষম না।" লাহোরের উর্দু সাময়িকী "এহসান" সম্পাদক আবু সাঈদ বাজ্‌মী বলেন, "এই গল্পের বিষয়বস্তু ও ভাষা আপত্তিজনক।"

বাদী ও বিবাদী সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হয়। শেখ খুরশীদ আহামদের বিশ্বাস, আমাদের জরিমানা অবধারিত। ১৬ই জানুয়ারী মামলার রায়দানের তারিখ ধার্য হয়। বাদীপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান শেষ হলে আমি লিখিতভাবে একটি জবানবন্দী ম্যাজিষ্ট্রেটর কাছে দাখিল করি। সেটা পড়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন, "এই বিবৃতিই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তিদানের জন্য যথেষ্ট।" লিখিত বিবৃতিতে বলেছি, লাহোরের 'জাবিদ' সাময়িকীতে প্রকাশিত গল্প "ঠাণ্ডা গোস্তের" লেখক আমি। বাদীদের মতে এই গল্প নাকি অশ্লীল ও নৈতিকতা বহির্ভূত। আমি এই মত সমর্থন করিনা। কারণ গল্পটি যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্লীল নয়। অশ্লীলতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে, সাহিত্য কখনও অশ্লীল হতে পারে না। "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পটিকে সাহিত্যের গণ্ডী থেকে বের করে নিলে অশ্লীল হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এই গল্পটি একজন সাহিত্যিকের সৃষ্টি এবং তা আধুনিক সাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী। তা ছাড়া এই লেখকের বহু গল্প বিভিন্ন সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে আমার গল্পকে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত করে তিনবার মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় আমার জরিমানা হয়েছে কিন্তু আপীলে প্রত্যেক বারেই সেসব কোর্টে দায়রা জজ আমাকে ও আমার গল্পগুলিকে অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেন।

"ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্পের পটভূমিকা ৪৬ সালের দাঙ্গার ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু এর মূল ভিত্তি মানবিক মনস্তত্ত্ব। মানুষের মানস -"যৌনচেতনার" সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। "ঠাণ্ডা গোস্ত" পড়ে যদি কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন তাহলে তার কোন মানসিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। আসলে কবির কবিতা, শিল্পীর চিত্র ও লেখকের গল্প শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ মানুষের জন্য রচিত। আমার গল্প স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের জন্য যারা নারী পুরুষের সম্পর্ক বাঁকা চোখে দেখেন না। পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন যাঁরা পবিত্র ধর্ম গ্রন্থেও নোংরা ও অশ্লীলতার গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু এইসব লোকের যথাযথ চিকিৎসা করানো উচিত।

"ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প একটি বাস্তব চিত্র। এতে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে একটি মানবিক সমস্যার বাস্তব রহস্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে যদি কোন প্রকার অশ্লীলতা বা নোংরামী দেখতে পান তার জন্য গল্পের

চরিত্রের মানসিকতাই দায়ী লেখক নয়। কোন রচনার কয়েকটি শব্দকে পৃথক করে দেখে অশ্লীল আখ্যা দেয়া অযৌক্তিক। শেষ কথা হচেছ, বাদী পক্ষ আমার গল্প "ঠাণ্ডা গোস্তের" কোন প্রকার সাহিত্যিক সমালোচনা করেনি, তাহলে আমি আনন্দিত হতাম। গল্পে যদি কোন প্রকার শিল্প দুর্বলতা, শব্দ যোজনা ও শব্দ চয়নে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তা ধরে দিলে খুশীর ব্যাপার হত। অথচ আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি গল্প লিখে মানুষের অনুভূতিকে আহত করেছি। এর বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ করা ছাড়া কোন গতি নেই। আশ্চর্যের বিষয়, "ঠাণ্ডা গোস্ত" গল্প পড়ে কারী সাহেবের মনে ঘৃণা ও ভীতির সঞ্চারের পরিবর্তে ক্ষোভ জন্মতে পারে। তাছাড়া ইশ্বর সিং-এর এইরূপ ভয়াবহ শাস্তিলাভ সত্বেও মানুষের মনে ও কল্পনায় নোংরা মনোভাব কিভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে?"

১৬ই জানুয়ারী এসে পড়ে। শেখ সলিম চিন্তামুক্ত হওয়ার জন্য মদ পানের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আরেফ আবদুল মতিনের গলা আরও শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

১৬ই জানুয়ারী সকালে পকেটে ৫ শত টাকা পুরে জেলা কাচারীর দিকে যাত্রা করি। শেখ সলিম সেখানেই উপস্থিত ছিল আর কিছুক্ষণ পর পর ঘন ঘন বোতল থেকে মদ গলাধকরণ করছিল।

এর মধ্যে নাসির আনোয়ার ও আরেফ আবদুল মতিন এসে হাজির হয়। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, মামলার রায় কি হবে? আমি জবাব দিলাম, "আল্লার হুকুম যা আছে তাই হবে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও এসেছেন। বেলা বারটা বাজে।

আমি ভাবছি কি ধরনের শাস্তি হবে একমাস দুইমাস বা কয়েক দিনের জেল? আরও কত কি। অবশ্য আমার মনোভাব শেখ খুরশীদকে জানিয়ে দিয়েছি। শেখ খুরশীদ আহমদ বললেন, "জেল খুব বেশী হলে ১০/১২ দিনের হতে পারে। কিন্তু ভয় হয় পাছে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন দিতে অস্বীকার করে বসে?" এ কথা শুনে আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি। কারণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মনোভাব প্রথম থেকেই বিরূপ ছিল। আমি নাসির আনোয়ার ও আবদুল মতিনকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেই যেন টাকার ব্যবস্থা করে রাখে, অন্যথায় পরে ঝামেলা পোহাতে হবে। শেখ সলিম চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অবিরাম মদ্য

পান করেন এবং আমার জন্য জেলে কিভাবে আরাম-আয়াসের ব্যবস্থা করা যায় তার পরিকল্পনা করেন।

বন্ধুবর মোস্তাক আহমদ আমার জামিনের জন্য একজন বিত্তশালী লোককে পাকড়াও করে হাজির করেছে। সে বেচারী আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্তি ও বিরক্তবোধ করছিল। শেখ সেলিম অপর একজন জামিনদার দেখে রেগে ওঠে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, জামানত নেয়ার জন্য আরও দু'জন আসামী রয়েছে। অতএব চিন্তার কোন কারণ নেই। শেখ সলিম বুড়ে ছিলেন আরও এক পেগ গলায় ঢেলে নতুন স্কীম তৈরীতে মগ্ন হয়ে পড়েন।

বেলা ৫টা বাজে। আমাদের উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি পায়। ম্যাজিষ্ট্রেট এম সাঈদ হাক দিলে আমাদের কৌসুলী শেখ খুরশীদ আহামদ হন হন করে আমাদের ডেকে নিয়ে যায়। আমরা সকলে গিয়ে আদালতে হাজির হই। সকলের বুক দরু দুরু করছিল। সাংবাদিকরাও আদালতে উপস্থিত ছিল: কাগজ-কলম হাতে নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে। সকলে আদালতের রায় ঘোষণার প্রতীক্ষায় ছিল।

এবার ম্যাজিষ্ট্রেট এম, সাঈদ রায় ঘোষণা করলেন, আমাকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও তিন শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও একুশ দিন সশ্রম কারাদণ্ড। অপর দুইজনকে মাথা পিছু তিন শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে ২১ দিন করে সশ্রম কারা ভোগ করতে হবে।

আমি সাথে সাথে জরিমানার টাকা দাখিল করে দিই। শেখ খুরশীদ তক্ষুণি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে জামানতের কাগজ-পত্র পেশ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এস, সাঈদ জানান, "আমি যদি জামিন দিই তা হলে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

শেখ খুরশীদ যুক্তি প্রদর্শন করেন, "আপনার বক্তব্য সত্য কিন্তু আসামীর জরিমানার টাকা আদায় করে দিয়েছেন। এই টাকা আপীল মঞ্জুর হলে ফেরত পাওয়া যাবে।' কিন্তু জামিন লাভের পূর্বে আমার মক্কেল যে ২/৩ দিন জেলে কাটাবে আপীলে খালাস পেলে তা কি ফেরৎ পাওয়া যাবে?" এই যুক্তি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এম সাঈদ সাহেব কিছুক্ষণ তালবাহানার পর জামিন মঞ্জুর করেন।

আরেফ আবদুল মতিনের পিতা তার জরিমানার অর্থ আদায় করেন। কিন্তু বিপদ হল নাসির আনোয়ারকে নিয়ে। আমার পকেটে ২ শত টাকা ছিল। চৌধুরী

নাজির আহমদকে ১ শত টা । সংগ্রহের নির্দেশ দেই। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করলে, নাসিব নির্ভীক চিত্তে জবাব দেয় তার কাছে কোন টাকা-কড়ি নেই। পুলিশ তাকে হাত কড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত। শেখ খুরশীদ আহমেদ অবশেষে অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় নাসিব আনোয়ারকে তাঁর জিম্মায় জামিন দানের অনুরোধ জানান এবং আগামী কাল তিনি জবিমানাব টাকা আদায় করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দন। কিন্তু জামিন কে হবে? হঠাৎ শেখ সলিম দুলতে দুলতে গিয়ে বলে, "আমিই তার জামিন হলাম।" আমি ভয়ে আড়ষ্ট! পাছে মদ্যপায়ী শেখ সলিমের জন্য সব পণ্ড হয় এবং আদালতের অমর্যাদার জন্য গ্রেফতার হয়ে না পড়ে। যা হোক, সকলে আদালতের বাইরে চলে এলাম। শেখ সলিম বাইরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কথা হ'ল অল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করেছে। এরপর পকেট থেকে বোতল বের করে কয়েক পেগ মদ গলায় ঢেলে বলে, "চল তাড়াতাড়ি না হলে সব দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।"

অবাব সেসন আদালতে আপীলের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ১৯৫০ সালের ২৮শে জানুয়ারী সেসন কোর্টে আপীল করি। শুনানীর তারিখ ধার্য হলে আমরা যথারীতি দায়রা জজ মেহেরুল হকের আদালতে হাজির হই। তিনি আমাকে ভাল করে চেনেন এবং একই শহরের (অমৃতসর) বাসিন্দা বলে মামলা অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ জোসোয়ার আদালতে স্থানান্তর করেন। মিঃ জোসোয়া উর্দু ভাষায় পারদর্শী নন তাই তিনি মামলার নথিপত্র পুনরায় মেহেরুল হকের আদালতে ফেরত পাঠান। পরে ভেবে চিন্তে দায়রা জজ মেহেরুল হক আমাদের অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব এনায়েত উল্লাহ খানের এজলাসে প্রেরণ করেন। দায়রা জজ এনায়েত উল্লা খান সাহেব বললেন, এই ধরনের মামলা তার হাতে প্রথম। মামলা পর্যালোচনার জন্য সময়ের প্রয়োজন। তাই তিনি একমাস পর আমাদের মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য করেন। খুরশীদ সাহেব বললেন, মামলা একজন নামাজী দাড়িওয়ালা জজের হাতে পড়েছে। মনে হয় বিশেষ সুবিধা হবে না। আমি জবাবে বললাম, "বাদ দেন। এখানে না হয় তো হাইকোর্টে দেখা যাবে।" ইতিমধ্যে শেখ খুরশীদের সুবিধার্থে 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্পের সমালোচনা লিখে দিই। ১০ই জুলাই সকালে আমরা আদালতে সবাই গিয়ে হাজির হই। আমার ভয় ছিল ইনিও যদি ম্যাজিষ্ট্রেট এম সাঈদের মত কড়া মেজাজের হন তা হলে আমার ধৈর্য্য ধারণ অসম্ভব হয়ে

পড়বে। পৌনে এক ঘন্টা অপেক্ষার পর জজ সাহেবের আদালতে আমাদের সকলের ডাক পড়ে। আমরা সকলে জজসাহেবকে সালাম জানিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে কাঠগড়ার দিকে যাচ্ছি। জজ সাহেব আমাদের সকলকে চেয়ারে উপবেশনের নির্দেশ দিলেন। আমরা সকলে আপন আপন চেয়ারে বসলাম।

জজ সাহেব বললেন, আমি নিম্ন আদালতের রায় গভীরভাবে মনযোগের সাথে পড়েছি। সাক্ষীদের জেরা ও জবানবন্দী অধ্যয়ন প্রয়োজন মনে করিনি। অবশ্য 'ঠাণ্ডা গোস্ত' গল্প ভালভাবে পড়েছি। আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "আপনারা কি সকলেই জরিমানা আদায় করেছেন?" আমরা সমস্বরে "জী হাঁ" বলে জবাব দিলাম। জজ সাহেব বললেন, "আপনাদের জরিমানা ফেরত দেয়া হবে।"

কিছুক্ষণ পর শেখ খুরশীদ আমার বাহু ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললেন, "চলুন আপনারা সকলে বেকসুর খালাস পেয়েছেন।"

আদালতের বাইরে এসে চাপরাসীদের ১০ টাকা করে বখশিশ দেয়ার পর অনুভব করলাম সত্যিই আমি মুক্ত। এবার ৪র্থ বারের মত আমি অশ্লীলতার অভিযোগ থেকে বেকসুর মুক্তি পেলাম। আমি মনে মনে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম কারণ তিনিই আমাকে এক বিরাট পাপের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। শেখ খুরশীদ আহামদ নিজের সাফল্যের জন্য আনন্দে আত্মহারা।